সাধু নাগমহাশয়

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

উদ্বোধন কার্য্যালয়, কলিকাতা

প্রকাশক

স্বামী আত্মবোধানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৩

মুদ্রাকর

শ্রীব্রজেন্দ্রচন্দ্র ভট্টাচার্য

ইকনমিক প্রেস

২৫, রায়বাগান স্ট্রীট্, কলিকাতা ৬

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ কর্তৃক

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

নবম সংস্করণ

পৌষ, ১৩৬৩

এক টাকা আট আনা

উৎসর্গপত্র

মহাসমন্বয়াচার্য শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের লীলাসহচর
শ্রীমৎ প্রেমানন্দ স্বামীজির করকমলে
"সাধু নাগমহাশয়" সাদরে সমর্পণ
করিলাম। ইতি

বিনয়াবনত
শ্রীশরচ্চন্দ্র দেবশর্মা

যোঽহংভাব-বিবর্জিতস্তপশশি-জ্যোৎস্নাভিরুদ্ভাসিতঃ
ভোগাসক্তি-নিরাকৃতো গুরু-কৃপা-মন্ত্রেণ সংপ্রাণিতঃ।
দৈন্যামানিত্ব-কেতনং গুরুপদে ভৃঙ্গায়মানো মুদা
বন্দেঽহং শিরসা সদা তমমরং নাগাখ্যমুদ্ধারকম্॥

নিবেদন

যাঁহার দেবচরিত্র আমার ধর্মজীবনের প্রথম পথপ্রদর্শক, যাঁহার অদ্ভুত দীনতা সর্বংসহা ধরিত্রী দেবীকেও পরাজিত করিয়াছিল, যিনি গৃহী হইয়াও সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র বলিয়া সর্বথা পরিগণিত হইতেন এবং যাঁহার ত্যাগ, তিতিক্ষা, তপস্যা ও তীব্র তেজস্বিতা যথার্থই অলোকসামান্য ছিল, সেই শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ নাগমহাশয়ের জীবনের কয়েকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করিবার বাসনা বহুকাল হইতে বলবতী থাকিলেও নানা কারণে তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। পরে মাননীয় নাট্যকার শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঐ বিষয়ে আমাকে উৎসাহিত করায় এবং তিনি ও শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী সারদানন্দ গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত দেখিয়া দেওয়ায় আপনাকে একান্ত অনধিকারী জানিয়াও আমি ঐ মহাত্মার জীবন-চরিত্র এইরূপ আংশিকভাবে লিপিবদ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছি। পরিশেষে এই গ্রন্থপাঠে কাহারও কিছুমাত্র আধ্যাত্মিক উপকার হইলে এবং নাগমহাশয়ের পুণ্য-চরিত্রের পূর্ণপ্রভাব যথাযথ অঙ্কিত করিতে যোগ্যতর কোন ব্যক্তিকে ইহা ভবিষ্যতে কিঞ্চিন্মাত্র পথ-প্রদর্শন বা উৎসাহিত করিলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কলিকাতা, ১লা বৈশাখ, সন ১৩১৯ সাল

অলমতি
গ্রন্থকারস্য

সূচীপত্র

জন্ম ও বাল্য-জীবন ...

কলিকাতায় আগমন ...

দ্বিতীয়বার বিবাহ ও ডাক্তারী ব্যবসায়

শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন ...

দেশে অবস্থান ...

গৃহস্থাশ্রম ও গুরুস্থান ...

ভক্তসঙ্গে ...

মহাসমাধি ...

পরিশিষ্ট ...

জন্ম ও বাল্যজীবন

যাঁহার জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে আমি প্রবৃত্ত হইতেছি, পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার সম্বন্ধে বলিতেন, "পৃথিবীর বহু স্থান ভ্রমণ করিলাম, *নাগমহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষ কোথাও দেখিলাম না।*"

পূর্ববঙ্গে নারায়ণগঞ্জ বন্দরের আধক্রোশ পশ্চিমে দেওভোগ নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী আছে; তথায় ১২৬৩ সালের ৬ই ভাদ্র * তারিখে নাগমহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। সেদিন শুক্লা প্রতিপদ তিথি, চন্দ্র সিংহভবনে। নাগমহাশয়ের সম্পূর্ণ নাম দুর্গাচরণ নাগ; কিন্তু এই গ্রন্থে আমরা তাঁহাকে 'নাগমহাশয়' বলিয়াই উল্লেখ করিব, কেননা অনেকের কাছে তিনি এই নামেই সুপরিচিত। নাগ-মহাশয়ের পিতার নাম দীনদয়াল, মাতার নাম ত্রিপুরাসুন্দরী। দীনদয়ালের পিতা প্রাণকৃষ্ণ, মাতা রুক্মিণী। ইঁহাদের আদি নিবাস তিলারদি; দেওভোগ গ্রামে দুই-তিন পুরুষের বাস। দীনদয়াল ব্যতীত প্রাণকৃষ্ণের দুইটি কন্যা হইয়াছিল; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা ভগবতী নবম বর্ষে বিধবা হইয়া আমরণ পিতৃগৃহে বাস করিতেন। কনিষ্ঠা ভারতী-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই; শুনা যায় তিনি পিত্রালয়ে বড় একটা আসিতেন না এবং জ্যেষ্ঠা ভগবতীর পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

নাগমহাশয়ের জন্মের চারি বৎসর পরে তাঁহার কনিষ্ঠা ভগিনী সারদামণি জন্মগ্রহণ করেন। সারদার জন্মের দুই বৎসর পরে

* ইংরেজী ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ, ২১শে আগষ্ট

দীনদয়ালের আর একটি কন্যা হয়, কিন্তু সেটি চারি মাসের বেশী জীবিত ছিল না। ইহার দুই বৎসর পরে ত্রিপুরাসুন্দরী আর একটি পুত্র প্রসব করেন। প্রসবগৃহ হইতে বাহির হইয়াই সূতিকা-রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রসূতির একমাস পরে শিশুটিও তাঁহার অনুগমন করে।

ননদিনী ভগবতীর ক্রোড়ে পুত্র-কন্যা দুইটিকে সমর্পণ করিয়া মাতা লোকান্তরিতা হইলেন। নাগমহাশয়ের বয়স তখন আট বৎসর, সারদার চার। পিতা আর বিবাহ করিলেন না। ভগবতী বালবিধবা, অতি যত্নে ভ্রাতার পুত্র-কন্যার লালন-পালন করিতে লাগিলেন, বিশেষতঃ নাগমহাশয়কে। ভগবতীর স্নেহ ও পালনের কথা স্মরণ করিয়া নাগমহাশয় বলিতেন, "এই পিসীমাই আমার জন্ম-জন্মের মা ছিলেন।"

দীনদয়াল দেবদ্বিজ-ভক্তিপরায়ণ নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। তিনি কলিকাতায় কুমারটুলীতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার ও শ্রীযুক্ত হরিচরণ পাল চৌধুরী মহাশয়দিগের গদিতে সামান্য চাকরী করিতেন। বাসাবাটীরূপে কুমারটুলীতে দীনদয়ালের একখানি খোলার ঘর ছিল।

দীনদয়ালের সহিত পাল বাবুরা প্রভু-ভৃত্যের ন্যায় ব্যবহার করিতেন না, তাঁহাকে পরিবারভুক্ত পরিজনের মধ্যে গণ্য করিতেন। ধর্মভীরু, সত্যনিষ্ঠ, নির্লোভ দীনদয়ালের উপর পালবাবুদের প্রভূত বিশ্বাস ছিল। দীনদয়ালের নিকট কখনও তাঁহারা নিকাশ তলব করেন নাই। একবার কয়েক হাজার টাকা হিসাবে গরমিল হয়। দীনদয়াল চুরি করেন নাই তাঁহাদের ধারণা; তাই সমস্ত

টাকা বাক্সে খরচ হিসাবে লিখিয়া লইতে আদেশ দিলেন। ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে সেই টাকা ধরা পড়ে। তাহাতে বাবুদিগের ধারণা দৃঢ়তর হইল এবং দীনদয়ালের উপর বিশ্বাস বাড়িল। সেই অবধি দীনদয়াল যাহাতে দশ টাকা উপার্জন করিতে পারেন, সে সম্বন্ধে পালবাবুরা বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। এই ক্ষুদ্র কর্মচারীর নির্লোভতার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

পালবাবুদের নুন-চালানির কাজ ছিল; নৌকাযোগে মধ্যে মধ্যে নারায়ণগঞ্জে নুন পাঠাইতে হইত। তখন জাহাজাদির চলাচল তেমন হয় নাই এবং সুন্দরবনের ভিতর দিয়া গতিবিধি করিতে হইত বলিয়া নৌকাপথে বিলক্ষণ দস্যুভয় ছিল; সেজন্য প্রতি চালানের সঙ্গে একজন সাহসী ও বিশ্বস্ত কর্মচারীকে যাইতে হইত। একবার দীনদয়াল চালান লইয়া যাইতেছিলেন। নৌকা সুন্দরবনে প্রবেশ করিলে নিরাপদ স্থান পাইবার পূর্বেই সন্ধ্যা হইল। আর অগ্রসর হওয়া দীনদয়াল যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন না। অদূরে একখানি প্রকাণ্ড ভাঙ্গা বাড়ী ও তন্নিকটে দুইখানি কৃষকের ঘর দেখিতে পাইয়া তিনি সেইখানেই নৌকা বাঁধিতে বলিলেন। রাত্রে আহারাদি করিয়া দাঁড়ি-মাঝিরা ঘুমাইতে লাগিল। দীনদয়াল একা একগাছি লাঠি পাশে রাখিয়া সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বসিয়া তামাক খাইতে লাগিলেন। ক্রমে রাত্রি শেষ হইল। ভোর প্রায় পাঁচটার সময় দীনদয়াল নৌকা হইতে নামিয়া ভাঙ্গা বাড়ীর এক-পাশে শৌচে বসিলেন। তাঁহার স্বভাব একটু চঞ্চল ছিল, বসিয়া বসিয়া অঙ্গুলি দ্বারা সন্নিকটস্থ মৃত্তিকা খুঁড়িতে লাগিলেন। একটু খুঁড়িতেই দীনদয়ালের মনে হইল টাকার মত হাতে কি ঠেকিতেছে!

উৎসুক হইয়া আর একটু মাটি সরাইলেন, দেখিলেন একঘড়া মোহর। দীনদয়াল দুই-চারিটি মোহর তুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন সব প্রাচীনকালের। তিনি সেগুলি পুনরায় মাটি চাপা দিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া নৌকায় আসিলেন এবং মাঝিদের বলিলেন, "ওরে এখানে বড় ভয়ের আভাস পেয়েছি, এখনি নৌকা ছেড়ে দে।" মাঝিদের শৌচাদির জন্য একটু অবসর-প্রার্থনায় কর্ণপাত করিলেন না। সেখান হইতে দুই-তিন ক্রোশ সরিয়া গিয়া নৌকা বাঁধিতে বলিলেন। দীনদয়াল বলিয়াছিলেন, "গুপ্তধনে প্রথমে তাঁহার লোভ হইয়াছিল, কিন্তু তখনই মনে হইল—যদি ইহা কোন ব্রাহ্মণের অর্থ হয়, তবে ব্রহ্মস্বাপহরণ-পাপে অনন্তকাল নরকে বাস করিতে হইবে।" পাছে প্রোথিত অর্থ তাঁহাকে পুনঃ প্রলোভিত করে সেজন্য তিনি সেস্থান ত্যাগ করিয়া পলাইয়া আসেন।

নাগমহাশয়ের বাল্য-জীবনের ঘটনা বেশী কিছু সংগ্রহ করিতে পারা যায় নাই। শৈশবকাল হইতেই তিনি অতিশয় মিষ্টভাষী, সুশীল ও বিনীত ছিলেন। সে সময় তাঁহার গঠন-সৌন্দর্য অতীব মনোহর এবং আকারও বেশ হৃষ্টপুষ্ট ছিল। মাথায় লম্বা লম্বা চুল থাকায় তাঁহাকে অতি সুন্দর দেখাইত। দরিদ্রের ঘরে জন্ম, দুগাছি রূপার বালা ভিন্ন অন্য কোন আভরণ কখন তাঁহার অঙ্গে শোভা পায় নাই। কিন্তু সেই লম্বিতকেশ স্বভাবসুন্দর শিশু যখন নাচিয়া নাচিয়া খেলা করিত, তখন তাহাকে দেখিয়া মুগ্ধ না হইত এমন কেহ ছিল না। প্রতিবাসিনী প্রৌঢ়াগণ সেই প্রিয়দর্শন বালককে দেখিলেই ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়া আদর

করিতেন। কিন্তু আদর করিয়া কিছু খাইতে দিলে বালক কদাচ তাহা গ্রহণ করিত না।

শান্তস্বভাব বালক সন্ধ্যার সময় একা বসিয়া তারকাখচিত আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিত। কখন পিসীমাকে আব্দার করিয়া বলিত, "চল মা, আমরা ঐ দেশে চলে যাই, এখানে থাকতে আর ভাল লাগে না।" চন্দ্রোদয় হইলে বালক পরমানন্দে করতালি দিয়া নাচিয়া বেড়াইত। বাতাসে বৃক্ষসকল দুলিলে বালক ভাবিত তাহারা ডাকিতেছে; 'মা, আমি ওদের সঙ্গে খেলা করব' বলিয়া দোদুল্যমান তরুরাজির মত আঁকিয়া বাঁকিয়া অপূর্ব ভঙ্গীতে নৃত্য করিত। সে মনোরম নৃত্য দেখিয়া পিসীমা আনন্দে আত্মহারা হইয়া বালকের মনোহর মুখে বার বার চুম্বন করিতেন।

পুরাণের গল্প বলিতে পিসীমা বড় নিপুণা ছিলেন, রূপকথার ছলে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি উপাখ্যান বলিয়া বালককে ঘুম পাড়াইতেন। যে দিন সংসারের কার্যে নিতান্ত অবসন্না হইয়া পড়িতেন সেদিন আর পিসীমার গল্প বলা হইত না; কিন্তু বালক কিছুতেই ঘুমায় না, অশান্ত হইয়া মহা আব্দার করে। অন্ততঃ একটি ছোটখাট গল্প না বলিলে পিসীমার নিষ্কৃতি নাই। পিসীমা যেসকল গল্প বলিতেন, কোন কোন দিন বালক সেসকল অবিকল স্বপ্নে দেখিত! স্বপ্নে দেব-দেবীর মূর্তি দেখিয়া কখন কখন ভয়ে জাগিয়া উঠিত; পার্শ্বে পিসীমাতা দিনের শ্রমের পর অকাতরে পড়িয়া ঘুমাইতেছেন, বালক মহা ভীত হইলেও তাঁহাকে জাগাইত না, স্থির হইয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া থাকিত।

রাত্রি প্রভাত হইলে নাগমহাশয় পিসীমাকে স্বপ্নকাহিনী শুনাইতেন, শুনিতে শুনিতে পিসীমা বিস্ময়ে অভিভূত হইতেন।

ছেলেবেলায় খেলাধূলায় নাগমহাশয়ের তেমন মন ছিল না; কিন্তু সঙ্গীতের আগ্রহে তাঁহাকে কখন কখন খেলিতে হইত। ক্রীড়ার সময় যদি কেহ মিথ্যাকথা বলিত, তিনি তাহার সহিত আলাপ বন্ধ করিতেন এবং যতক্ষণ না সে অনুতপ্ত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিত আর কখনও মিথ্যাকথা বলিবে না, ততক্ষণ তাহার সহিত সৌহৃদ্য করিতেন না। বাল্যকালেও নাগমহাশয় কখনও কাহারও সহিত কলহ করেন নাই। যদি কখনও বালকে বালকে বিবাদ হইত, তিনি মধ্যস্থ হইয়া এমন সুন্দরভাবে তাহা মিটাইয়া দিতেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষদ্বয় পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার নায়কতা স্বীকার করিত। ক্রীড়া বা পরিহাসচ্ছলেও নাগমহাশয় কখনও মিথ্যাকথা বলিতেন না। অতি শিশুকাল হইতেই তাঁহার অমিয় চরিত্রে আবালবৃদ্ধবনিতা সমভাবে মুগ্ধ হইতেন। দেওভোগে এখনও এমন লোক জীবিত আছেন, যাঁহারা একবাক্যে বলেন— দীনদয়ালের পুত্রের ন্যায় সুশীল, সরল, সচ্চরিত্র ও বিনীতস্বভাব বালক তাঁহারা আর দেখেন নাই।

মাতার মৃত্যুর পর পিসীমার আদর-যত্নে আরও কয় বৎসর কাটিয়া গেল। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বালকের জ্ঞান-পিপাসাও বাড়িতে লাগিল। এখনকার মত তখন বিদ্যালয়ের এত ছড়াছড়ি ছিল না। নারায়ণগঞ্জে একটিমাত্র বাঙ্গলা স্কুল ছিল। নাগমহাশয় সেইখানে পড়িতে লাগিলেন। কিন্তু এখানে তৃতীয় শ্রেণী অবধি পড়িয়া আর তাঁহার পড়া হইল না। কেননা, তৃতীয় শ্রেণী এই স্কুলের

সর্বোচ্চ শ্রেণী ছিল। সেই অবধি পড়িয়া পড়া ছাড়িতে হইল—নাগমহাশয় অতিশয় ক্ষুণ্ণ হইলেন। পূজার সময় দীনদয়াল দেশে আসিলে তিনি পড়িবার জন্য কলিকাতায় যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কিন্তু দীনদয়াল সম্মত হইলেন না; বলিলেন, "সামান্য আয়ে কলিকাতায় পড়ার ব্যয় বহন করা আমার পক্ষে একান্ত অসম্ভব।" নাগমহাশয়ের নিদারুণ মর্মপীড়া হইল; কলিকাতায় পড়িবার আশা জলাঞ্জলি দিয়া তিনি দেশে স্কুলের সন্ধান করিতে লাগিলেন। শুনিলেন, ঢাকায় অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে। নারায়ণগঞ্জ হইতে ঢাকা পাঁচ ক্রোশ দূর। সেখানে পড়িতে গেলে নিত্য দশ ক্রোশ পথ হাঁটিতে হইবে। পিসীমা এই প্রস্তাবের প্রতিকূল হইলেন, বালকসঙ্গীরা অনেক বারণ করিল; নাগমহাশয় কাহারও কথা মানিলেন না। কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোঁচার খোঁটে চারটি মুড়কি বাঁধিয়া লইয়া পরদিন সকালে ঢাকা যাত্রা করিলেন। বিদ্যালয়ের অনুসন্ধানে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল। একটি বাঙ্গলা স্কুল মনোনীত করিয়া বাটী ফিরিলেন। বাটী আসিতে সন্ধ্যা অতীত হইল। পিসীমা তখন পাড়ায় পাড়ায় তাঁহাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন। নাগমহাশয়কে প্রত্যাগত দেখিয়া তাঁহার আর আনন্দের সীমা রহিল না। অগ্রে যত্ন করিয়া আহার করাইলেন, তারপর সমস্ত দিন অদর্শনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নাগমহাশয় সকল কথা বর্ণনা করিয়া বলিলেন, "কাল হইতেই পড়িতে যাইব ঠিক করিয়াছি, সকালে ৮টার মধ্যে দুটি রাঁধিয়া দিতে হইবে।" বালকের আগ্রহ দেখিয়া পিসীমা বলিলেন, "তা রামজী তোর মঙ্গল করবেন, পথে তোর কোন বাধা-বিঘ্ন হবে না।"

পরদিন স্কুলে ভর্তি হইবার মত কিছু সম্বল লইয়া আহারাদি করিয়া ৮টার সময় নাগমহাশয় ঢাকা গেলেন এবং নর্ম্যাল স্কুলে ভর্তি হইলেন। এই বিদ্যালয়ে তিনি পনর মাস পড়িয়াছিলেন। এই পনর মাসের মধ্যে তাঁহার কেবল দুই দিন মাত্র স্কুল কামাই হইয়াছিল। রৌদ্র, বৃষ্টি, হিম সমভাবে মাথার উপর দিয়া গিয়াছে; একদিনের জন্যও তাঁহার অটল অধ্যবসায় দমিত হয় নাই। কিন্তু উৎকট পরিশ্রমে তাঁহার শরীর দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। তিনি বলিতেন, "ঢাকায় পড়িতে যাইতে আমার তিলমাত্র কষ্ট অনুভূত হইত না। সোজাসুজি বনের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতাম। ফিরিবার সময় যদি কোন দিন ক্ষুধার উদ্রেক হইত, এক পয়সার মুড়কি কিনিয়া খাইতে খাইতে বাড়ী চলিয়া আসিতাম।"

একদিন বাড়ী আসিবার সময় তিনি পথে একটি প্রেতাত্মা দেখিতে পান। এ সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন, "ভূত প্রেত প্রভৃতি অপদেবতা কিছুই মিথ্যা নহে। কারণ, ঠাকুর বলতেন—ওসব সত্য। ঢাকায় যখন হেঁটে পড়তে যেতাম তখন এক দিন বাড়ী ফেরবার সময় বড় রাস্তার পোলের ধারে এক ভূত দেখেছিলাম। নিকটবর্তী একটা প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ আশ্রয় করে ভূতটা পশ্চিমমুখো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমি আনমনে আসছি আর হঠাৎ ঐটে নজরে পড়ে গেল; দেখে বসে পড়লাম। কিন্তু বহুক্ষণ চেয়ে চেয়েও যখন দেখি ঐ ভূতটা সরে গেল না, তখন মনে হল—ও কি ছাই ভূত ভস্ম! আমি ত ওর কোন অনিষ্ট করি নি, ও কেন আমার অনিষ্ট করবে? এই ভেবে জোর করে দাঁড়ালাম, সাহস করে অগ্রসর হতে লাগলাম। ঐ গাছের নীচ

দিয়ে এলাম, কিন্তু আমায় কিছুই বললে না। ঐ গাছ পেরিয়ে গেছি, এমন সময় আমার পেছনে ভয়ানক অট্টহাসির আওয়াজ কানে পেতে লাগলাম। কিন্তু আমি আর ফিরে চেয়ে দেখলাম না। ঢাকায় যাওয়া-আসার সময় আরও দুই-তিন দিন তার দর্শন পেয়েছি। কিন্তু আমায় কোন দিনও কিছু বলে নি। শেষে দেখে দেখে মানুষের মত বোধ হোত।”

নাগমহাশয়ের উপর এই স্কুলের এক শিক্ষকের পুত্রনির্বিশেষ স্নেহ ছিল। তাঁহাকে নিত্য পদব্রজে যাইতে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, “বাবা, আর অমন কষ্ট করে পড়তে এস না। না হয় আমার ওখানে থাকবে, যে করে হোক তোমার খরচ চালাব।” নাগমহাশয় উত্তর দিলেন, “আমার কোন কষ্টই হয় না।” পড়া-শুনায় তাহার আগ্রহ দেখিয়া উক্ত শিক্ষক বলিতেন, “না জানি কালে এ বালক কি হইয়া দাঁড়াইবে!” শিক্ষক জীবিত থাকিলে দেখিতেন, তাঁহার ভবিষ্যদ্‌বাণী অক্ষরে অক্ষরে সফল হইয়াছিল।

ঢাকা নর্ম্যাল স্কুলে নাগমহাশয় অত্যল্প কাল মাত্র পড়িয়াছিলেন। কিন্তু এই অল্পদিনেই বাঙ্গলা ভাষা অতি সুন্দররূপে তাহার আয়ত্ত হয়। তাঁহার হস্তাক্ষর যেমন মুক্তাপঙ্‌ক্তির ন্যায়, রচনাও তেমনি সরল, সারবান ও হৃদয়গ্রাহী ছিল। সেকালের তুলনায় সেরূপ সুন্দর রচনা অতি বিরল। তাহার এই সময়ের সকল প্রবন্ধই ধর্ম ও চরিত্রগঠনের উদ্দেশ্যে রচিত। ভবিষ্যতে যখন নাগমহাশয় কলিকাতায় ডাক্তারি পড়িতে আসেন, সেই সময় এই রচনাগুলি ‘বালকদিগের প্রতি উপদেশ’ নাম দিয়া পুস্তকাকারে ছাপাইয়াছিলেন। এই পুস্তক-প্রণয়ন বা মুদ্রণসম্বন্ধে তিনি কখনও

কাহাকেও কোন কথা বলেন নাই। এমনকি, তাঁহার চিরসুহৃদ্ সুরেশচন্দ্র দত্তও পুস্তক মুদ্রিত হইবার পূর্বে কিছু জানিতে পারেন নাই। বই ছাপা হইলে নাগমহাশয় তাঁহাকে একখণ্ড উপহার দিয়াছিলেন। তাহার পর পুস্তকগুলি দেশস্থ বালকদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন। দেওভোগে এই পুস্তকের দুই-এক খণ্ড এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

নাগমহাশয়ের পরম ভক্ত হরপ্রসন্ন মজুমদার মহাশয়ের গৃহিণী নাগমহাশয়ের মুখে তাঁহার বাল্যজীবন-সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছিলেন; তাহার কিয়দংশ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি লেখককে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল—

"বাবার (নাগমহাশয়ের) বাল্যজীবন কিংবা কোন জীবনের ঘটনা আমি অবগত নহি বা কোনরূপে লিপিবদ্ধ করি নাই। তবে আমার সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর তিনি উপদেশচ্ছলে আমাকে যাহা যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার স্মরণার্থ কিছু কিছু ঘটনা আমি একখানা বহিতে লিখিয়াছিলাম। কিন্তু তাহাতে তাঁহার জীবনের বিশেষ কোন ঘটনা পাইবার বা জানিবার কোন আশা নাই। তবে দুই-একটি ঘটনা, যাহা তিনি নিজমুখে আমাকে বলিয়াছিলেন তাহাই তোমার অনুরোধে লিখিতেছি। বোধ হয় তাহা তুমিও জান। কিন্তু তোমার অনুরোধ এড়াইতে আমার সাধ্য নাই; কারণ, আমি জানি তুমি তাঁহার আদরের সন্তান ছিলে। ধর্ম-সম্বন্ধে আমার সহায়তায় যদি কাহারও কোন উপকার হয়, আমি একাগ্রহৃদয়ে অকুণ্ঠিতচিত্তে তাহা করিতে স্বীকৃত আছি। ইহাতে

যদি আমার স্বার্থের হানি হয় অথবা বিষয়সম্পর্ক-ত্যাগেও তোমাদের কিছুমাত্র সহায়তা হয়, তবে আপনাকে ধন্য মনে করিব।

"সত্য কথা সম্বন্ধে তিনি নিজ মুখেই একদা বলিয়াছিলেন যে, কোন সময়ে খেলার সময় তাঁহার সমবয়স্ক সখাগণ তাহাদের অপর পক্ষকে জব্দ করিবার জন্য একটি মিথ্যা কথা বলিতে বাবাকে বার বার অনুরোধ করে। বাবা তাহা বলিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তাহাদের পক্ষের হার হয়; তাহাতে তাঁহার বাল্যবন্ধুগণ আসিয়া বাবাকে ধানক্ষেতের উপর টানিয়া টানিয়া তাঁহার কোমলাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়। বাবার সে যন্ত্রণা স্মরণ করিয়া আমার এখনও অশ্রুপাত হয়। এইরূপ অকারণ শাস্তি দিয়া বাবার সখাগণ আরও বলে—'তোমার সত্য কথায় যদি আমাদের আবার এরূপ হার হয় তবে এর চেয়ে অধিক শাস্তি দিব।' বাবা রক্তাক্তশরীরে গৃহে প্রত্যাগত হইলে, তাঁহার বাবা ও পিসীমাতা এ বিষয়ে কত মতে জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু ইহা লইয়া পাড়ায় একটা গোলযোগ হইবে মনে করিয়া বাবা ঘুণাক্ষরেও এ বিষয়ে কিছু প্রকাশ করেন নাই।

"১৩।১৪ বৎসর বয়সে তিনি নাকি ঢাকা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন।*

* কিন্তু শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন—"একথা সত্য নহে। নাগমহাশয় কলিকাতায় আসিয়া ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে ভর্তি হইয়া দেড় বৎসর অধ্যয়ন করেন। পরে হোমিওপ্যাথি শিক্ষা করেন। ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলে পড়িতে যাইতেন মাত্র। কলিকাতায় যখন আমার সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, তখন দেখিয়াছিলাম তিনি 'Hiley's Grammar' (হিলির ব্যাকরণ) পড়িতে পারিতেন। অনেকস্থল কণ্ঠস্থ ছিল। কিন্তু সকল কথা ভালরূপ

"সকাল সকাল তাঁহার পিসীমাতা বাবাকে আলুভাতে ভাত রাঁধিয়া দিতেন, তিনি তাহাই খাইয়া পায়ে হাঁটিয়া ঢাকায় পড়িতে যাইতেন। আবার পায়ে হাঁটিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন। একদিন ঢাকা হইতে ফতুল্লা গ্রাম পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছেন; ভয়ানক ঝড়-বৃষ্টি ও অন্ধকারে, দেশে যেন প্রলয়ের সূচনা হইয়াছে; ফতুল্লার দোকান-পসার সব বন্ধ হইয়া গিয়াছে—এ সময় কাহাকেও ডাকিলে কদাচ দোর খুলিয়া দিবে না; বিশেষতঃ নিজের সুবিধার জন্য অন্যকে বিরক্ত করা ছোটকাল হইতেই বাবার অভ্যাস ছিল না। সুতরাং ঝড়-বৃষ্টি মাথায় করিয়াই বাবা অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তখন বৈশাখ মাস। ভয়ানক মেঘগর্জন ও প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে বাবার মনে মহা আতঙ্ক উপস্থিত হইল; ঘন ঘন বিদ্যুতের উন্মেষণে তিনি রাস্তা দেখিয়া চলিতে লাগিলেন। নারায়ণগঞ্জের অনতিদূরে অবস্থিত শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউর মন্দিরের পাশ দিয়া বাবার বাড়ীতে যাইতে রাস্তার ধারে যে একটি পুকুর আছে, চলিতে চলিতে বাবা হঠাৎ পা পিছলাইয়া ঐ পুকুরে পড়িয়া যান; শত চেষ্টাতেও আর উঠিতে পারেন না, দূর্বাঘাস ধরিবার চেষ্টা করেন, তাহাও ছিঁড়িয়া যায়; তথাপি বাবা সাহসে ভর করিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার কেবল পিসীমার মুখ স্মরণ হইতে লাগিল। না জানি তিনি বাবার জন্য ভাবিয়া কতই আকুল হইতেছেন—এই চিন্তা করিয়া রামনাম করিতে করিতে বহু

উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। আমি তাঁহাকে বলিতাম, 'তোমাদের বাঙ্গাল-দেশে পণ্ডিত জন্মায় বটে, কিন্তু এ দেশের লোকের মত ইংরেজী বলতে কইতে পারে না।' তিনি আমার কাছেও একটু একটু ইংরেজী পড়িতেন।"

আয়াসে বাবা পুকুর হইতে উঠিয়া পড়েন। তাহার পর কিছুই হয় নাই, এইরূপ ভাবে ধীরে ধীরে বাড়ীতে উপস্থিত হন। বাবার পিসীমাতা তখন চিন্তিতা হইয়া বাতি লইয়া কেবল ঘর-বাহির করিতেছিলেন এবং তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছিলেন। বাবা বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া কিন্তু ঘটনার বিন্দুবিসর্গও পিসীমাকে বলেন নাই। এই মাত্র বলিয়াছিলেন, 'আজ পথে খুব ভিজেছি, আর তেমন কোন কষ্ট হয় নি।' ”

নাগমহাশয় ক্রমে কিশোর-বয়সে পদার্পণ করিলেন। মাতৃহীন বালকের সংসার-বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য পিসীমা তাঁহার বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। ঘটক দ্বারা পাত্রী অন্বেষণ করাইয়া কলিকাতায় দীনদয়ালকে সংবাদ দিলেন। বিক্রমপুরের অন্তর্গত রাইজদিয়া গ্রামনিবাসী জগন্নাথ দাসের একাদশবর্ষীয়া কন্যা প্রসন্নকুমারীর সহিত নাগমহাশয়ের বিবাহ হইল। প্রসন্নকুমারীর তিন সহোদর—মহেশ, হরেন্দ্র ও ভগবানচন্দ্র। জগন্নাথ বেশ অবস্থাপন্ন লোক ছিলেন।

নাগমহাশয়ের ও তাঁহার ভগিনী সারদার এক রাত্রে বিবাহ হয়। গোধূলি-লগ্নে ভ্রাতার এবং শেষরাত্রে ভগিনীর বিবাহ হইল। বিবাহের পাঁচ মাস পরে নাগমহাশয় কলিকাতায় আসিলেন।

কলিকাতায় আগমন

কলিকাতায় আসিয়া পিতার বাসায় থাকিয়া নাগমহাশয় ক্যাম্বেল মেডিকাল স্কুলে ডাক্তারী পড়িতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার অধ্যয়নস্পৃহা যেমন বলবতী ছিল, তেমন ফলবতী হইতে পারে নাই। এখানেও তাঁহার দেড় বৎসরের অধিক পড়া হইল না। কি কারণে যে তিনি ক্যাম্বেল স্কুল পরিত্যাগ করেন, তাহা তাঁহার জীবনের অনেক ঘটনার মত অন্ধকারাচ্ছন্ন।

ক্যাম্বেল স্কুল ছাড়িয়া নাগমহাশয় বিখ্যাত ডাক্তার বিহারীলাল ভাদুড়ীর নিকট হোমিওপ্যাথি পড়িতে আরম্ভ করেন। ডাক্তার ভাদুড়ী নাগমহাশয়ের অমিয় চরিত্রে দিন দিন অধিকতর আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন এবং তাঁহার অধ্যয়নে আগ্রহ দেখিয়া অতি যত্ন-সহকারে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। কার্যক্ষেত্রে ব্যবহারিক শিক্ষা দিবার জন্য তিনি নাগমহাশয়কে সঙ্গে করিয়া রোগী দেখিতে যাইতেন। সকাল-সন্ধ্যা দুবেলা যাইয়া নাগমহাশয় ভাদুড়ীর নিকট পড়িয়া আসিতেন এবং বাসায় বসিয়া অধীত বিষয়ের পুনরালোচনা করিতেন। এইরূপে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল।

ডাক্তারী শিক্ষার জন্য নাগমহাশয়কে এখন অধিকাংশ সময়ই কলিকাতায় থাকিতে হইত। বধূও প্রায় পিত্রালয়ে থাকিতেন। সুতরাং বিবাহের পর পরিবারের সহিত আলাপ পরিচয় হইবার তাঁহার বড় সুযোগ হয় নাই। সুযোগ হইলেও নাগমহাশয় বধূর সংস্পর্শে আসিতে ভীত হইতেন। তিনি যখন দেশে যাইতেন,

বধূ যদি সে সময় দেওভোগে থাকিতেন, পাছে তাঁহার সহিত রাত্রিযাপন করিতে হয়, এই ভয়ে সন্ধ্যা হইলেই গাছে উঠিয়া বসিয়া থাকিতেন। পিসীমা তাঁহাকে নিজের ঘরে স্থান দিবেন, এরূপ অঙ্গীকারাবদ্ধ না হইলে তিনি কদাচ নামিয়া আসিতেন না। যোগমায়া বলিয়া দীনদয়ালের বাসায় একজন পরিচারিকা ছিল। দীনদয়াল তাহাকে কন্যার মত দেখিতেন; নাগমহাশয় তাহাকে 'বোনদিদি' বলিয়া ডাকিতেন। যোগমায়া কখন কখন দীনদয়ালের সঙ্গে দেওভোগে যাইত। বধূর উপর নাগমহাশয়ের ঈদৃশ ব্যবহার সে স্বচক্ষে দেখিয়া সুরেশ বাবুকে বলিয়াছিল।

পিসীমা ভ্রাতুষ্পুত্রের এই অলৌকিক আচরণ দেখিয়া মনকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন—বধূর সহিত সদ্ভাব-সম্প্রীতি এখন না হউক, কালে হইবে। কিন্তু হায়! দুরন্ত কাল তাহার সকল আশা-ভরসায় ছাই দিয়া অকালে বধূটিকে হরণ করিয়া লইল! কলিকাতায় সংবাদ আসিল, আমাশয়-রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। বালিকার অকাল মৃত্যু নাগমহাশয়ের হৃদয় স্পর্শ করিল, কিন্তু এক পক্ষে তাঁহার মনে শান্তি আসিল। ভগবান সংসারবন্ধন হইতে অব্যাহতি প্রদান করিলেন ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন। দীনদয়ালের বড়ই আঘাত লাগিল। আপনি গৃহশূন্য হইয়া আর দারপরিগ্রহ করেন নাই; ভাবিয়াছিলেন পুত্রের বিবাহ দিয়া ভাঙ্গাঘর নূতন করিয়া বাঁধিবেন। হায়, বিধাতার বিড়ম্বনা। উপায় কি? দীনদয়াল স্থির করিলেন, পুত্রের আবার বিবাহ দিবেন। পুত্রকে লইয়া অবিলম্বে দেশে গেলেন, কিন্তু মনোমত পাত্রী পাওয়া গেল না। দেশে দুদিন থাকিবার উপায় নাই—নিজের কাজকর্মের ক্ষতি,

পুত্রেরও পড়াশুনার ব্যাঘাত। জামাতার উপর কন্যা-নির্বাচনের ভার দিয়া পুত্রসহ পুনর্বার কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন।

আবার হোমিওপ্যাথি-চর্চা আরম্ভ হইল। একটি ছোটখাট ঔষধের বাক্স কিনিয়া নাগমহাশয় পাড়ায় পাড়ায় গরিব-দুঃখীদিগকে চিকিৎসা ও ঔষধবিতরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ডাক্তার ভাদুড়ী বলিতেন, অনেক উৎকট দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে নাগমহাশয়ের নির্দিষ্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়া তিনি উৎকৃষ্ট ফললাভ করিয়াছেন। ঔষধ-নির্বাচনে নাগমহাশয়ের আশ্চর্য নিপুণতা ছিল। নাগমহাশয়ের শাশুড়ী একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন; তিনি জামাতার অলৌকিক চিকিৎসা দেখিয়া বলিতেন, "জামাই আমার সাক্ষাৎ মহাদেব, যাহাকে যা ঔষধ দেন, তাহাতেই তাহার কল্যাণ হয়।" ক্রমে চারিদিকে নাগমহাশয়ের সুনাম ছড়াইয়া পড়িল। পঠদ্দশাতেই নবীন চিকিৎসক গরিব-দুঃখীদের ভরসাস্থল হইয়া দাঁড়াইলেন। ক্রমে বাসায় রোগীর ভিড় বাড়িতে লাগিল। ইচ্ছা হইলে নাগমহাশয় এখন হইতেই অর্থোপার্জন করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। এই সময় তিনি যে চিকিৎসা করিতেন তাহা ব্যবসায় নহে—পরোপকার।

পরোপকার করিবার সুযোগ নাগমহাশয় কখনও ছাড়িতেন না। পরের জন্য হীন কার্য করিতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার পিতৃবন্ধুগণ সময়ে সময়ে তাঁহার দ্বারা হাট-বাজার করাইয়া লইতেন। নাগমহাশয় তাহাদের চালের মোট, কাঠের বোঝা পর্যন্ত বহন করিতেন।

বিপন্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য নাগমহাশয় সর্বদাই

বদ্ধপরিকর ছিলেন। প্রেমচাঁদ মুন্সী বলিয়া হাটখোলায় একজন ধনী ছিলেন। প্রভূত অর্থ থাকিলেও মুন্সী মহাশয় বাসায় চাকর রাখিতেন না। তাঁহার এক দূরসম্পর্কীয় ভাই ছিল, ভাতরাঁধা হইতে জলতোলা পর্যন্ত সে-ই সমস্ত কার্য করিত। মুন্সী মহাশয় প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন। তাঁহার নিত্যকর্ম ছিল স্নানের পূর্বে একবার নাগমহাশয়দের বাসায় আসা, আর মুহুর্মুহুঃ নাগমহাশয়কে দিয়া তামাক সাজাইয়া খাওয়া; তারপর তেল চাহিয়া লইয়া মাখিতেন, পরে গঙ্গাস্নান করিয়া বাটী ফিরিতেন। এইরূপে দিন যাইতেছিল। দৈবাৎ তাঁহার সেই ভাইটি মরিয়া গেল। প্রেমচাঁদ বড় কৃপণ ছিলেন, বাজে খরচের ভয়ে পাড়ার লোকের সঙ্গে মেশামেশি করিতেন না। আজ ভারি বিপদে পড়িলেন, সৎকার করাইবার জন্য একটি লোকও পাইলেন না। লক্ষপতি কায়স্থ প্রতিবাসিগণের দ্বারে দ্বারে ফিরিলেন, কিন্তু একটি প্রাণীও তাঁহার সহায় হইল না। নিরুপায় মুন্সী মহাশয় নাগমহাশয়দের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। পিতা-পুত্রে শবদাহ করিয়া তাঁহাকে সে যাত্রা রক্ষা করেন।

নাগমহাশয় ডাক্তার ভাদুড়ীর কাছে প্রায় এক বৎসর পড়িবার পর সুরেশবাবুর সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। সুরেশ তাঁহাকে মামা বলিয়া ডাকিতেন; কেন এখন তাঁহার স্মরণ নাই। হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্তবংশে সুরেশের জন্ম। শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপালাভের পূর্বে তিনি ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন। একদিকে সুরেশচন্দ্র নিরাকার ব্রহ্মবাদী, ঠাকুর-দেবতা কিছুই মানেন না; অন্যদিকে নাগমহাশয় গোঁড়া হিন্দু, দেব-দ্বিজে অটলশ্রদ্ধাপরায়ণ। সময়ে সময়ে উভয়ে

ঘোরতর বাক্‌যুদ্ধ হইত। নাগমহাশয় বলিতেন, "হিন্দুর দেব-দেবীও সত্য, আর ব্রহ্মবাদও সত্য। তবে অনেক সাধনভজনের পর জীবের জন্ম-জন্মান্তরে ব্রহ্মজ্ঞান হতে পারে, কিন্তু সে লক্ষের মধ্যে দু-এক জনের হয় কিনা সন্দেহ।" আবার বলিতেন, "বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, মন্ত্র তবে কি এসকল তুমি মিথ্যা বলতে চাও? ব্রহ্মজ্ঞান চরম লক্ষ্যস্থল বটে, কিন্তু এসকল পেরিয়ে না গেলে তা লাভ হতে পারে না। মহামায়ার কৃপা না হলে, তিনি পথ ছেড়ে না দিলে, কার সাধ্য যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে?" সুরেশ মুখে সতেজে উত্তর দিতেন, "রেখে দাও মামা, তোমার শাস্ত্র-মাস্ত্র, আমি ওসব মানি নি।" কিন্তু নাগমহাশয়কে প্রতি দেবদেবীর প্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে দেখিয়া এবং ব্রাহ্মণে তাঁহার অচলা শ্রদ্ধা দর্শন করিয়া সুরেশ মনে মনে বলিতেন—এরূপ বিশ্বাস থাকিলে অচিরে যে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইতে পারে, তাহার আর সন্দেহ কি?

প্রতি সন্ধ্যায় সুরেশ নাগমহাশয়ের বাসায় যাইতেন। প্রায় প্রতিদিনই এইরূপ বাদানুবাদ হইত, কিন্তু কেহ কাহাকেও স্বমতে আনিতে পারিতেন না। কি করিয়া যে এই পরস্পরবিরোধী প্রকৃতি পরস্পরকে প্রথম আকৃষ্ট করিয়াছিল, জানি না। কিন্তু প্রথম পরিচয় হইতে উভয়ের জীবনব্যাপী সৌহৃদ্য হইয়াছিল। দেখা হইলে ভগবৎ-প্রসঙ্গ ভিন্ন তাঁহাদের অন্য আলাপ হইত না।

সুরেশ নাগমহাশয়কে কখন কখন কেশববাবুর সমাজে লইয়া যাইতেন। কেশবের বক্তৃতায় নাগমহাশয় মুগ্ধ হইতেন; কিন্তু সমাজের আচার-ব্যবহার তাঁহার ভাল লাগিত না। ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত 'চৈতন্যচরিত,' 'রূপসনাতন,' 'মুসলমান সাধু-

গণের জীবন' প্রভৃতি গ্রন্থ নাগমহাশয় অতি আগ্রহের সহিত পাঠ করিতেন। নববিধান সমাজের 'আমায় দে মা পাগল করে' গানটি উন্মত্তভাবে গাইতেন, কিন্তু তাঁহার স্বরশক্তি ছিল না।

সুরেশ বলেন, প্রথম আলাপ হইতেই তিনি দেখিয়াছিলেন নাগমহাশয়ের জীবন একেবারে কালিমাশূন্য। বাল্যকাল হইতেই সদাচারী ও ধর্মনিষ্ঠ। নাগমহাশয় আজীবন সকল প্রকার লোকাচার, দেশাচার ও গৃহাস্থাচার মানিয়া চলিতেন, কখন তাহার অন্যথা করেন নাই। শোনা যায়, বাল্যকালে 'হাতেমতাই' গ্রন্থ নাগমহাশয়কে বিশেষ আকৃষ্ট করিয়াছিল, কিন্তু বিশ্বাস ও ঈশ্বরানুরাগ শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় তাঁহার সহজাত ছিল। এক সময় কয়েকটি বন্ধু নাস্তিকমতের পুস্তকাদি পাঠ করিয়া নানাভাবে নাস্তিক-মত প্রচার করিতেন। নাগমহাশয়ের সঙ্গে কখন কখন তাঁহাদের বাগ্‌বিতণ্ডা হইত। কিন্তু তর্কে পরাজিত হইয়াও নাগমহাশয় দৃঢ়স্বরে বলিতেন, "ঈশ্বর যে আছেন তাতে আমার তিলমাত্র সন্দেহ নাই।" ইহা তাঁহার প্রথম বয়সের কথা। ভাবী জীবনে তিনি পুনঃ পুনঃ বলিতেন, "আছে বস্তু নিয়া আবার বিচার কেন? ভগবান যে সূর্যের ন্যায় স্বতঃপ্রকাশ।"

এই সময় ডাক্তারী শিক্ষায় নাগমহাশয়ের আর তেমন অনুরাগ রহিল না। তৎপরিবর্তে শাস্ত্রচর্চা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পিতার অনুযোগে ডাক্তার ভাদুড়ীর সংস্রব একেবারে ত্যাগ করিতে পারিলেন না। নাগমহাশয় সংস্কৃতভাষা জানিতেন না। পুরাণ, তন্ত্র প্রভৃতির যেসকল বঙ্গানুবাদ হইয়াছিল, তাহাই যত্ন করিয়া পাঠ করিতেন। পণ্ডিত পাইলে আগ্রহ-সহকারে শাস্ত্রমর্ম বুঝাইয়া

লইতেন। নিত্য গঙ্গাস্নান ও নিয়মিতরূপে একাদশীব্রতপালন করিতেন এবং প্রতিদিন সায়াহ্নে কুমারটুলীর সন্নিকটে কাশী মিত্রের শ্মশানঘাটে বেড়াইতে যাইতেন। কোন কোন দিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত চিন্তাকুল হৃদয়ে সেখানে বসিয়া থাকিতেন। রাত্রি গভীর। লম্বিত শব বক্ষে ধারণ করিয়া ধিকি ধিকি চিতা জ্বলিতেছে! শ্মশান-বাসী অশ্বত্থের সহিত শ্মশানবাহিনী জাহ্নবী সমস্বরে স্বর মিলাইয়া জীবন-মরণের কি একটা করুণ গান গাহিতেছেন—সে গানের ভাষা নাই, অথচ তাহা মর্মস্পর্শী! নাগমহাশয় বসিয়া বসিয়া ভাবিতেন, অনিত্য, অনিত্য, সকলই অনিত্য! একমাত্র সত্য ভগবান, তাঁহাকে লাভ করিতে না পারিলে এ জীবন বিড়ম্বনা; কেমন করিয়া তাঁহাকে লাভ করিব? কে আমায় পথ বলিয়া দিবে?

কাশী মিত্রের শ্মশানঘাটে কখন কখন সাধু, সন্ন্যাসী, সাধক আসিতেন। নাগমহাশয় ব্যাকুল হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন। কেহই তাঁহাকে সদুত্তর দিতে পারিতেন না। নাগ-মহাশয় বুঝিলেন—অধিকাংশ সাধকই 'সিদ্ধি সিদ্ধি' করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন, পরাভক্তিলাভ তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। একদিন এক তান্ত্রিকের সঙ্গে এই শ্মশানে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। বামাচার-সাধনা কিরূপ জিজ্ঞাসা করিলে ঐ তান্ত্রিক কতকগুলি বীভৎস ব্যাপার বর্ণনা করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ব্যাখ্যা শুনিয়া নাগমহাশয় বলিলেন, "আপনাকে এখনও অনেক ঘাটের জল খেতে হবে। আপনি তন্ত্রের মর্ম কিছুই বুঝতে পারেন নি।" এইরূপ সন্ন্যাসী ও সাধক দেখিতে দেখিতে ধর্মে আস্থা হওয়া দূরে থাকুক, নাগমহাশয়ের কখন কখন সন্দেহের উদ্রেক হইত। কেবল

এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের উপর তাঁহার শ্রদ্ধা হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ তান্ত্রিক সন্ন্যাস লইয়া শ্মশানে সাধনা করিতেন। তাঁহার ভেদবুদ্ধি ছিল না, ব্যবহার উদার এবং অন্তর্দৃষ্টি প্রখর ছিল। ইনি নিয়মিত-রূপে কারণাদিরও ব্যবস্থা করিতেন। তান্ত্রিক সাধনার গূঢ়মর্ম এবং ষট্‌চক্ররহস্য অতি বিশদ ও সরলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। তন্ত্রমতে সাধন করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ নাগমহাশয়কে আশীর্বাদ করিয়া আশ্বাস দিয়াছিলেন যে মা জগদম্বা অচিরেই তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিবেন। এই সাধক-সম্বন্ধে নাগমহাশয় বলিতেন, "ব্রাহ্মণ সাধনার পথে খুব অগ্রসর হয়েছিলেন, পরিণামে তাঁর সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হয়।"

এই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের উপদেশে নাগমহাশয় মধ্যে মধ্যে মহানিশায় শ্মশানে বসিয়া জপ-ধ্যান করিতেন। একদিন ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার শুভ্রজ্যোতিঃ দর্শন হয়। সেই অবধি তিনি নিয়মিতরূপে শ্মশানে গিয়া জপ-ধ্যান করিতে লাগিলেন।

সেই কথা ক্রমে দীনদয়ালের কর্ণগোচর হইল। তিনি অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইলেন। অবিলম্বে পাত্রী স্থির করিবার জন্য জামাতাকে পত্র লেখা হইল। দীনদয়াল ভাবিয়াছিলেন – পুত্রের তরুণ বয়স, সংসারে কোন বন্ধন নাই, তাই শ্মশানে সাধু-সন্ন্যাসীর সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়ায়। বিবাহ দিলেই এই সকল দুর্বুদ্ধি দূর হইবে। জামাতাও ত্বরা করিয়া কন্যানির্বাচন করিলেন—দেওভোগ-নিবাসী রামদয়াল ভূঁইয়া মহাশয়ের প্রথমা পুত্রী শ্রীমতী শরৎকামিনীকে। কলিকাতায় সংবাদ আসিল। কিন্তু পুত্রের নিকট দীনদয়াল বিবাহের প্রস্তাব করিলে নাগমহাশয়

বলিলেন, "আমি আর বিবাহ করব না।" দীনদয়াল কত বুঝাইলেন—কিছুতেই পুত্রকে সম্মত করিতে পারিলেন না। এক একদিন কথায় কথায় কথান্তর হয়, পিতা রাগ করিয়া উপবাস করেন, সঙ্গে সঙ্গে পুত্রেরও উপবাস হয়। দিন বড় অশান্তিতেই কাটিতে লাগিল। দীনদয়াল বলিলেন, "তোর জন্য ভদ্রলোকদের কথা দিয়ে আমাকে এ বুড়ো বয়সে মিথ্যাবাদী হতে হল।"

নাগমহাশয়— একবার ত বিবাহ দিয়েছিলেন, তাতে ত তার মৃত্যু ঘটেছে—আবার কোথা থেকে কার মেয়ে এনে মৃত্যুর হাতে দিতে চাচ্ছেন ?

দীনদয়াল— যার অদৃষ্টে যা আছে বিধাতার ইচ্ছায় তাই হয়। আমি তোর বাপ, আমার আজ্ঞা না মানলে তোর কোন দিকে কিছুই হবে না। আমি শাপ দিয়ে যাব তোর যাতে ধর্মে উন্নতি না হয়।

বিষম বিপদ! একদিকে পিতার অভিশাপ, অন্যদিকে ধর্মের পথরোধ। যোষিৎসঙ্গ নরকের মূল, সেই পথেই পিতার প্রেরণা! হা ভগবান, কি হইবে ? অতি কাতর হইয়া নাগমহাশয় একদিন পিতাকে বলিলেন, "দেখুন, এই বিবাহ হতেই জীবের যত ক্লেশ উপস্থিত হচ্ছে। আপনি দয়া করে এই সঙ্কল্প হতে নিবৃত্ত হউন,—আর আমায় বন্ধনে ফেলবেন না। যতদিন আপনার শরীর আছে আমি কায়মনোবাক্যে আপনার সেবা করব। ঘরে বৌ এসে যা করবে, আমি তার চাইতে শতগুণে আপনার সেবা করব। আমায় অব্যাহতি দিন।"

পুত্রের বিষণ্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া, তাহার উপর তাহার কাতর-

বাক্য শুনিয়া বৃদ্ধের বড় দুঃখ হইল। ভাবিলেন—যাহার সুখের জন্য এই বিবাহের চেষ্টা করিতেছি, সেই যদি অসুখী হয়, তবে কাজ কি? এ সঙ্কল্প ছাড়িয়া দিই। কিন্তু তখনই তাঁহার মনে হইল, দুর্গাচরণ বিবাহ না করিলে বংশ নির্বংশ—পিতৃপুরুষগণের জলপিণ্ডের লোপ হইবে। দীনদয়াল বিচলিত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু উপায় কি? তর্ক-যুক্তি, তিরস্কার সকলই নিঃশেষ হইয়াছে। ব্যথিত হৃদয়ে বৃদ্ধ গোপনে বসিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় সেই সময় ঘরে ছিলেন না; ফিরিয়া আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন বৃদ্ধ পিতা কাঁদিতেছেন। হৃদয়ে বড় ব্যথা লাগিল, ভাবিলেন—বাপ বই এই সংসারে আপনার বলিতে আর আমার কেহই নাই। হায়! আমারই জন্য তাঁহাকে এত ক্লেশ পাইতে হইতেছে! দূর কর ছাই ধর্ম কর্ম, আজ হইতে পিতার কথাই পালন করিব। আমি বিবাহ করিলে যদি বাবার মনে শান্তি হয়, তাহাই করিব। পুত্র কালবিলম্ব না করিয়া বলিলেন, "বাবা, আমি বিবাহ করব।"

সহসা কথাটা বৃদ্ধের হৃদয়ঙ্গম হইল না, অশ্রুসিক্ত নয়নে পুত্রের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। নাগমহাশয় আবার বলিলেন, "বিবাহের দিন স্থির করে আপনি অবিলম্বে দেশে পত্র লিখুন।"

আহ্লাদে গদ্গদকণ্ঠে দীনদয়াল বলিলেন, "তুই যে আমার মান রক্ষা করলি, এতে আমার ধর্ম রক্ষা হল। বিবাহ করে তোর যেমন ইচ্ছা তেমনি করিস্, আমি কিছুই বলব না। আমি কায়মনোবাক্যে আশীর্বাদ করছি, ভগবান তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।" —বলিয়াই দীনদয়াল পালবাবুদের বাড়ী গিয়া

শুভসংবাদ প্রদান করিলেন। শুভসংবাদে সুখী হইয়া পালবাবুরা বলিলেন —বিবাহের আংশিক ব্যয় তাঁহারাই বহন করিবেন।

সকলেই সুখী, কিন্তু যাঁহার বিবাহ তাঁহার চিত্তে দারুণ হতাশ ভাব উপস্থিত হইল। পিতাকে বিবাহসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াই নাগমহাশয় বাটী হইতে বাহির হইয়া গেলেন। সমস্ত দিন পথে পথে ফিরিয়া, সমস্ত রাত্রি গঙ্গার কূলে বসিয়া আকুলহৃদয়ে কাঁদিতে লাগিলেন। ব্যথার ব্যথী নাই —মনের বেদনা কাহাকে বলিবেন? দিনরাত্রি অনাহারে কাটিয়া গেল। দীনদয়াল তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। বিবাহের দিন স্থির করিতে, দেশে চিঠি লিখিতে ও প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনিতে বৃদ্ধ অতি ব্যস্ত রহিলেন।

ক্রমে ক্রমে সকল দ্রব্যই কেনা হইল, কেবল পাত্রের পোশাক-পরিচ্ছদ বাকি। দীনদয়াল পাত্রকেই সেসকল মনোনীত করিয়া কিনিয়া আনিতে বলিলেন। কিন্তু নাগমহাশয় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। দীনদয়াল অবশেষে আপনিই সকল ক্রয় করিয়া আনিলেন।

আজ দেশে যাইবার দিন। দীনদয়াল জিনিস-পত্র গুছাইতেছেন; নাগমহাশয় প্রতিদিন যেমন সন্ধ্যার সময় গঙ্গাতীরে বেড়াইতে যাইতেন, আজও তেমনি গেলেন। গৃহে ফিরিবার পূর্বে মা গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "মা! শুনেছি তুমি পতিতপাবনী। সংসার-আশ্রমে গিয়ে যদি আমার গায়ে ধূলা কাদা লাগে, তা হলে মা ধুয়ে নিও। বিপদে সম্পদে মা আমায় তোমার শ্রীপদে স্থান দিও।" তাহার পর বাটী ফিরিয়া পিতাপুত্রে দেশে যাত্রা করিলেন।

দ্বিতীয়বার বিবাহ ও ডাক্তারী ব্যবসায়

বিবাহ-প্রসঙ্গে নাগ মহাশয় বলিতেন, "শুদ্ধ প্রজাকাম হয়ে বিবাহ করলে তাতে কোন দোষ স্পর্শায় না। কিন্তু পূর্বকার মুনি-ঋষিরাই ঐরূপ বিবাহের উপযুক্ত ছিলেন। আজীবন ব্রহ্মচর্য করে হয়ত সন্তানকামনায় বিবাহ করলেন। ব্যাস, শুকদেব, সনক, সনৎকুমারের ন্যায় পুত্র জন্মাইয়া অন্তে বানপ্রস্থাশ্রমে গমন করতেন। কিন্তু এই কলিকালে তেমনটি হবার উপায় নেই। এখন সেরূপ তপস্যা নেই, কাজেই কামজ পুত্রাদি উৎপন্ন হয়ে নানাব্যভিচারদোষদুষ্ট হয়।" তাহার পর নিজের এই দ্বিতীয় পরিণয়ের উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "কি করি? পিতৃ-আজ্ঞা! বিষবৎ বোধ হলেও আমাকে তা করতে হল।"

বিবাহের পাঁচ-ছয় দিন পূর্বে পিতাপুত্রে দেশে পৌছিলেন। দেখিতে দেখিতে শুভদিন উপস্থিত হইল। পাত্রীর বাটী দূর নয়, গ্রামেই। বাদ্যোদ্যম করিয়া দীনদয়াল মহানন্দে বর লইয়া চলিলেন। নির্বিঘ্নে শুভকার্য সম্পন্ন হইল। নাগমহাশয় মনে মনে এতদিন যে আশা পোষণ করিতেছিলেন—সংসারধর্ম না করিয়া ঈশ্বরলাভে যত্নবান হইবেন—তাহা ফুরাইল। ভাবিলেন—বিধাতার বিড়ম্বনায় যখন সংসারে প্রবেশ করিতে হইল, তখন অর্থের প্রয়োজন। চাকরির উপর আজীবন ঘৃণা—স্থির করিলেন স্বাধীন ব্যবসায় ডাক্তারী করিবেন। পিতাপুত্রে কলিকাতায় আসিলেন। সুরেশ

বলেন, এই সময় হইতে নাগমহাশয় ভিজিট লইয়া চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন।

অধ্যয়ন-সুখে, রোগীর পরিচর্যায়, সহৃদয় সুহৃদের সহিত সদালাপে, ভগবৎ-প্রসঙ্গে নাগমহাশয়ের নিশ্চিন্ত জীবন ধীরে ধীরে বহিতেছিল; কিন্তু সহসা নির্মল আকাশে একখানি মেঘ দেখা দিল। পত্র আসিল, পিসীমা পীড়িতা হইয়াছেন। একে বৃদ্ধ বয়স, তাহার উপর আমাশয় রোগ, নাগমহাশয় উদ্বিগ্ন হইয়া দেশে গেলেন। পিসীমার কাছে পৌছিবামাত্র তিনি আহ্লাদে বলিয়া উঠিলেন, "তোর মুখ দেখে যে মরতে পারব, এই আমার পরম সৌভাগ্য।" নাগমহাশয় বিস্তর চেষ্টা করিলেন, মাতৃস্থানীয়া পিসীমাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। মৃত্যুর পূর্বে নাগমহাশয়কে ডাকিয়া সকলের আহার হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করিলেন। অন্তিম সময়ের পনর মিনিট পূর্ব পর্যন্ত বৃদ্ধা বারান্দার সিঁড়িতে বসিয়া জপ করিতেছিলেন, বলিলেন, "আর কালবিলম্ব নাই।" নাগমহাশয়ের মাথায় হাত বুলাইয়া আশীর্বাদ করিলেন, "তোর যেন রামে মতি থাকে।" নাগমহাশয়ের সঙ্গে স্নেহময়ী পিসীমার ইহজীবনে এই শেষ কথা। পিসীমা রামমন্ত্রে দীক্ষিতা ছিলেন—"রা" বলিতে বলিতে তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হয়, নাগমহাশয় স্বকর্ণে শুনিয়াছিলেন। দ্বিতীয়বার বিবাহের সাত বৎসর পরে নাগমহাশয়ের পিসীমার মৃত্যু হয়।

শোক কি ইতঃপূর্বে নাগমহাশয় তাহা জানিতেন না। পত্নীর উপর তাঁহার মমতা বসে নাই—প্রথমা পত্নীর শোক তিনি আদৌ

পান নাই। শৈশবে মার মৃত্যু হইয়াছিল; এক মার পরিবর্তে আর এক মা পাইয়াছিলেন,—পিসীমার স্নেহ তাঁহাকে সে শোক ভুলাইয়া রাখিয়াছিল; আজ সেই পিসীমা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া গেলেন,—বড় গুরুতর বাজিল। গৃহবাস নাগমহাশয়ের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। ছুটিয়া ছুটিয়া পিসীমার চিতাভূমিতে যাইতেন. সেখানে পড়িয়া রাত্রিযাপন করিতেন, কখনও বা জঙ্গলে গিয়া রাত কাটাইতেন। তাঁহার কনিষ্ঠা ভগ্নী সারদা বলেন, "দাদা আমার এই ঘটনায় উন্মাদের মত হয়ে উঠেছিলেন। ডেকে স্নান-আহার করাতে হত। কখন দেখতাম—পশ্চিম ধারের জঙ্গলের পাশে মড়ার মত পড়ে আছেন। তাই বাবাকে চিঠি লিখে কলকাতা হতে বাড়ী আনান হয়।"

পিসীমার শ্রাদ্ধাদি করিয়া নাগমহাশয় পিতৃসঙ্গে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। শোকের উগ্র বেগ ক্রমে একটু কমিল বটে, কিন্তু আর এক চিন্তা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিল। নাগমহাশয় দিনরাত ভাবিতে লাগিলেন—মানুষ কেন জন্মগ্রহণ করে, কেন মরে? মৃত্যুর পরই বা তাহার কি গতি হয়? পিসীমার কি গতি হইল? তিনি কোন্ লোকে গেলেন? যে পিসীমা আমার গায়ে একটি আঁচড় লাগিলে কাতর হইতেন,—এত ভাবিলাম, এত কাঁদিলাম, কই তিনি ত আর ফিরিয়াও দেখিতেছেন না। মরিলেই যদি সমস্ত সম্পর্ক ফুরায়, তবে ছাই-ভস্ম কিসের এত 'আমার আমার'? এই জন্ম-জরা-মৃত্যুপূর্ণ সংসারে কেন আসিয়াছি, মনুষ্যজীবনের কর্তব্য কি? নাগমহাশয় দিনরাত এই চিন্তায় বিভোর হইয়া থাকিতেন।

নাগমহাশয় টাকা লইয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কাহারও নিকট কিছু চাহিতে পারিতেন না। শ্রদ্ধা করিয়া যে যাহা দিত, সন্তুষ্টচিত্তে তাহাই গ্রহণ করিতেন। তাঁহার পসার দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

ব্যবসায়ে নাগমহাশয়ের কোনরূপ বাহ্যাড়ম্বর ছিল না। গাড়ীঘোড়া ত নয়ই, তিনি কখন ডিস্‌পেন্সারিও করেন নাই। অনেক দূর-দূরান্তর হইতে তাঁহার ডাক আসিত; তিনি হাঁটিয়া যাইতেন। কেহ গাড়ী করিয়া লইয়া যাইতে চাহিলেও সম্মত হইতেন না। সামান্য জামা, জুতা, কাপড়, চাদর পরিয়া চিকিৎসা করিতেন। পরিপাটী পোশাক হইলে পসার প্রতিপত্তি আরও বাড়িবে ভাবিয়া দীনদয়াল একদিন মনোমত পরিচ্ছদ কিনিয়া আনিয়া দিলেন। কিন্তু পুত্র বলিলেন, "আমার পোশাকের কোন দরকার নেই, ঐ টাকা দিয়ে কোন গরিব-দুঃখীর সেবা করলে যথার্থ কাজ করা হত।" দীনদয়াল দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "তোর দ্বারা আমার অনেক আশা ছিল। এখন বুঝছি আমি আত্মবঞ্চিত হয়েছি। তুই যে দরবেশ হতে চলছিস্।" কেবল কি তাই? সংসার-অনভিজ্ঞ পুত্রের সকলই সৃষ্টিছাড়া! পাড়ার কে কোথায় ব্যাধিতে কষ্ট পাইতেছে, কে কোথায় অনাহারী, তাহার অনুসন্ধান ও প্রতিকার না করিয়া পুত্র জলগ্রহণ করে না। অসমর্থ ব্যক্তির নিকট হইতে ভিজিট ত লয়ই না, ঔষধের দামও নয়; অধিকন্তু পথ্য-খরচ দিয়া আসে। পথে পরিত্যক্ত নিরাশ্রয় রুগ্ন ব্যক্তিকে আপনার গৃহে আনিয়া চিকিৎসা করে। বুভুক্ষু ভিখারীকে মুখের অন্ন ধরিয়া দেয়। সকলই যেন কেমন কেমন।

একদিন এক গরিবের বাড়ী নাগমহাশয় চিকিৎসা করিতে যান। গিয়া দেখিলেন, রোগীর অবস্থা শোচনীয়। তিন-চারি ঘণ্টা বসিয়া তাহার শুশ্রূষা করিলেন, তাহাকে ঔষধ খাওয়াইলেন। রাত্রে আবার তাহাকে দেখিতে গেলেন। শীতকাল, একে শতচ্ছিদ্র খোলার ঘর, তাহার উপর রোগীর গাত্রবস্ত্র নাই। নাগমহাশয় ভাবিতে লাগিলেন—একে ইহার কঠিন রোগ, তাহাতে ঠাণ্ডায় এইভাবে পড়িয়া থাকিলে ত কিছুতেই ইহাকে বাঁচান যাইবে না। গায়ে একজোড়া ভাগলপুরী খেশ ছিল, সেইটি রোগীর গায়ে চাপা দিয়া নাগমহাশয় সেখান হইতে সরিয়া পড়িলেন। রোগী অনেক ডাকাডাকি করিল, কিন্তু তিনি ফিরিলেন না। দরজার বাহির হইতে উচ্চকণ্ঠে বলিয়া আসিলেন, "ভয় নেই, কাল আবার এসে দেখে যাব।" পরদিন সকালে রোগী তাহার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লাগিল। নাগমহাশয় বলিলেন, আমার চেয়ে তোমার শীতকাপড়ের অধিক প্রয়োজন মনে করেই তোমাকে সেখানি দিয়ে গেছি।" পুত্রের গায়ে খেশ না দেখিয়া দীনদয়াল পুত্রকে তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্যাপার শুনিয়া বিস্তর বকাবকি করিতে লাগিলেন। ফলে সেদিন আর পিতাপুত্রের আহার হইল না। পরদিন দীনদয়াল আবার একখানি শীতবস্ত্র কিনিয়া দিলেন। রোগী আরোগ্যলাভ করিলে নিত্য আসিয়া নাগমহাশয়কে প্রণাম করিয়া যাইত এবং তাহার সন্ধানে রোগী আসিলে তাঁহার চিকিৎসাধীন করিয়া দিত।

আর একদিন নাগমহাশয় একটি দরিদ্রকে চিকিৎসা করিতে গিয়া দেখিলেন রোগী ভূমি-শয্যায় পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহার বাসায়

একখানি অতিরিক্ত তক্তাপোশ ছিল। তৎক্ষণাৎ তাহা লইয়া গিয়া রোগীকে শয়ন করাইলেন—তাহার পর চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন। দীনদয়াল এই সকল বড় পছন্দ করিতেন না।

একটি ক্ষুদ্র শিশুর বিসূচিকা হইয়াছিল। নাগমহাশয় সমস্ত দিন ধরিয়া তাহার চিকিৎসা করেন, কিন্তু শিশুটি কিছুতেই বাঁচিল না। সুরেশ বলেন, "আমি ভেবেছিলাম সেদিন তিনি অনেক টাকা ভিজিট পাবেন। সন্ধ্যাকালে দেখলাম তিনি রিক্তহস্তে কাঁদতে কাঁদতে গৃহে ফিরছেন এবং বলছেন, 'আহা! সেই গৃহস্থের একমাত্র শিশু-সন্তানকে কিছুতেই রক্ষা করা গেল না! তাদের গৃহ শূন্য হয়ে গেল।' সে রাত্রে আর তিনি জলস্পর্শ করতে পারলেন না।"

নাগমহাশয়ের পসার দিন দিন আরও বাড়িতে লাগিল। পালবাবুরা তাঁহাকে গৃহ-চিকিৎসক নিযুক্ত করিলেন। সেজন্য পালবাবুরা এখনও তাঁহাকে ডাক্তার বলিয়া উল্লেখ করেন। বাবু হরলাল পাল বলেন, নাগমহাশয় যতদিন তাঁহাদের গৃহচিকিৎসক ছিলেন, ততদিন তাঁহাদের বাটীতে একটিও অকাল মৃত্যু ঘটে নাই। একবার তাহাদের একটি আত্মীয়া স্ত্রীলোকের বিসূচিকা হয়। নাগমহাশয় চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু রোগ ঔষধ না মানিয়া উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। ভীত হইয়া নাগমহাশয় ডাক্তার ভাদুড়ীকে ডাকাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ভাদুড়ী আসিলে কি কি ঔষধ দেওয়া হইয়াছে বলা হইল। ভাদুড়ী শুনিয়া বলিলেন, "ব্যবস্থা ঠিকই হয়েছে, আমার আর নূতন কিছু করবার নেই।" পালবাবুরা জেদ করিলেন, কিন্তু ডাক্তার ভাদুড়ী ঔষধ ত

দিলেনই না, অধিকন্তু বলিয়া গেলেন রোগীকে যেন হস্তান্তরিত করা না হয়। নাগমহাশয়ের সুচিকিৎসায় ক্রমে রোগী আরোগ্যলাভ করিলে চিকিৎসকের উপর পালবাবুদের শ্রদ্ধা বর্ধিত হইল। তাঁহারা আর অন্য চিকিৎসক ডাকিতেন না, অতি কঠিন রোগেও নাগ-মহাশয়ের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতেন। স্ত্রীলোকটি সম্পূর্ণরূপে সারিয়া পথ্য করিবার পর পালবাবুরা একদিন একটি রূপার কৌটা টাকায় ভর্তি করিয়া নাগমহাশয়কে পুরস্কার দিলেন। প্রতিপালক বলিয়া পালবাবুদের স্বহস্ত হইতে নাগমহাশয় কখনও ভিজিট গ্রহণ করিতেন না। বলিতেন, "যাহা হয় বাবাকে দিবেন।" রূপার কৌটা কি টাকা তিনি কিছুই গ্রহণ করিলেন না। পালবাবুরা ভাবিলেন, পুরস্কার মনের মত হয় নাই, তাই নাগমহাশয় লইতে অনিচ্ছুক। তাঁহারা যাহা দিয়াছিলেন তাহার উপর আরও পঞ্চাশটি টাকা দিয়া লইবার জন্য তাঁহাকে বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, "ঔষধের মূল্য ও তাঁর ভিজিট কিছুতেই কুড়ি টাকার বেশী হতে পারে না।" নিতান্ত জেদ করায় সেই কুড়িটি টাকা লইয়া চলিয়া গেলেন। অগত্যা পালবাবুরা বাকি টাকা শারদীয়া পূজার সাহায্যের জন্য দীনদয়ালের নামে জমা করিয়া রাখিলেন।

বাবুদের মুখে এই ঘটনা শুনিয়া দীনদয়ালের ধৈর্যচ্যুতি হইল। সামান্য অর্থের জন্য তাঁহাকে এই বৃদ্ধবয়সে চাকরি করিতে হইতেছে, আর তাঁহার নির্বোধ পুত্র কিনা আপনার ন্যায্য প্রাপ্য উপেক্ষা করিয়া প্রত্যাখ্যান করে! কিন্তু তিরস্কার বা উপদেশ সকলই বিফল হইল। পুত্র বলিলেন, "আপনিই ত আমাকে সর্ব্বদা ধর্মপথে

থাকতে উপদেশ দেন। আমি জেনেশুনে কি করে বেশী টাকা আনতে পারি? আমি ঠিক জানি, এ কয়দিন যেসব ওষুধ দিয়েছি, তার দাম জোর ছয় টাকা, আর এই সাত দিনে আমার পারিশ্রমিক চৌদ্দ টাকার বেশী হতে পারে না; তাই কুড়ি টাকা এনেছি। আমি আর বেশী টাকা নিলে অধর্ম করা হত। আপনি যেন বাকি টাকা আর কদাচ না নেন।"

দীনদয়াল— বাবুরা যদি তোর উপর খুশী হয়ে তোকে বাকি টাকা পারিতোষিক দিয়ে থাকেন, তুই কি তা গ্রহণ করবি না? এরূপভাবে তোর ব্যবসায় আর চলবে না।

নাগমহাশয়— তা যদি না চলে, না চলবে; আমি যা অন্যায় বলে বুঝতে পারব, তা প্রাণান্তেও আমার দ্বারা করা হবে না। ভগবান সত্যস্বরূপ, মিথ্যা ব্যবহারে ইহকাল পরকাল নষ্ট হয়।

উত্তর শুনিয়া দীনদয়াল বুঝিলেন, এই পুত্র কখনই সংসারে উন্নত হইতে পারিবে না।

এদিকে পুত্র ভাবিতে লাগিলেন—হায় হায়! ইহারই নাম সংসার! এই যথার্থ ভবাটবী! ছলে বলে টাকা আনিতে পারিলেই তবে সংসারে তাহার নাম-যশ, প্রতিপত্তি লাভ হয়। এমন সংসারে আমার কোন প্রয়োজন নাই। সদ্‌ভাবে থাকিয়া ভিক্ষাবৃত্তি-অবলম্বনে দেহ রক্ষা করা শ্রেয়ঃ, তথাপি যাহা অন্যায় বলিয়া বুঝিয়াছি সেই কার্য দ্বারা অর্থ উপার্জন করিয়া এই অসার দেহের পুষ্টিসাধন করা কিছু নয়।

নাগমহাশয়ের যেরূপ পসার বাড়িয়াছিল, বিষয়বুদ্ধি থাকিলে তিনি অনেক টাকা উপার্জন এবং সঞ্চয় করিতে পারিতেন। কিন্তু

যে স্থলে তাঁহার মাসিক তিন চারি শত টাকা হওয়া উচিত ছিল, সে স্থলে ত্রিশ চল্লিশ টাকা মাত্র হইত। ভিজিট বলিয়া তিনি কাহারও নিকট কিছু চাহিতেন না, যে যাহা দিত পরমাদরে তাহাই গ্রহণ করিতেন। চতুর লোক পারতপক্ষে তাঁহাকে ঠকাইতে ছাড়িত না। কেহ চিকিৎসা করাইয়া ভিজিট দিত না। কেহ ধার লইয়া পরিশোধ করিত না। সুরেশ বলেন, "মামা চিকিৎসা করে ফিরে আসবার সময় দেখেছি, চার পাঁচ জন লোক তাঁর নিকট টাকা হাওলাত করিবার জন্য বাসায় বসিয়া আছে। কেহ কিছু চাহিলে নাগমহাশয় 'না' বলিতে পারিতেন না। সেইজন্য অনেক সময় তিনি যাহা উপার্জ্জন করিয়া আনিতেন, তাহা হাওলাতবরাত দিতেই একপ্রকার নিঃশেষ হইয়া যাইত। এক এক দিন নিজের আহারের সংস্থান পর্য্যন্ত থাকিত না। যেদিন এইরূপ হইত, সেদিন তিনি দুই এক পয়সার মুড়ি খাইয়া দিন কাটাইতেন। অথচ হয়ত সেদিন তাঁহার সাত আট টাকা উপার্জ্জন হইয়াছে। তাঁহার নিকট ধার লইয়া কেহ কখন উপুড় হস্ত করিতেন না; অধিকন্তু কেহ কেহ আবার বলিতেন, 'তোমার আবার ভাবনা কি? তোমাকে ঈশ্বর দিবেন।" নিজের জন্য নাগমহাশয় কখনও এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় করেন নাই। হাতে যাহা কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত, দীনদয়ালকে দিতেন। আপনার জামা-জুতা কিনিবার প্রয়োজন হইলে পিতার নিকট চাহিয়া লইতেন। সঞ্চয়ের কথায় তিনি বলিতেন, "যখন যাহার যাহা প্রয়োজন হয়, ভগবান অবশ্য তাহা পূর্ণ করিয়া দেন। আমাদের ভাবনায় চিন্তায় কিছুমাত্র ফল নাই। ভগবানে নির্ভর করিলে একূল-ওকূল দুকূলই বজায়

থাকে। আমরা 'অহং'-বুদ্ধি লইয়া যাহা যাহা করিতে চাই, তাহাতেই পরিণামে ঠেকিতে হয়,—ইহা আমার প্রত্যক্ষ দেখা।"

নাগমহাশয় অধর্ম্ম, কপটাচার বা ভণ্ডামীর কখনও প্রশ্রয় দিতেন না। একদিন নবযৌবনসম্পন্না একটি বৈষ্ণবীসঙ্গে এক ভেকধারী বৈষ্ণব তাঁহার বাসায় ভিক্ষা করিতে আসে। নাগমহাশয় তখন ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। দ্বারে 'রাধে রাধে' রব শুনিয়া বাহিরে আসিলেন বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীকে দেখিয়াই তাঁহার আপাদমস্তক জ্বলিয়া গেল। বলিলেন, "অমন ঢং করিয়া 'রাধে রাধে' বলিলে ভিক্ষা পাইবে না। যদি একবার মনে প্রাণে বলিতে পার, পাইবে।" তাহারা আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল। নাগমহাশয় ভাবিতে লাগিলেন, "হায় হায়, এই ত ঘোর কলিযুগ পৃথিবীকে গ্রাস করিতে আসিয়াছে। আজ চক্ষের সামনে সাক্ষাৎ কলিকাল দেখিলাম।"

বৈষ্ণব-বৈষ্ণবীর মত একদিন একটি ভৈরব ভৈরবীসঙ্গে তাঁহার বাসায় ভিক্ষা করিতে আসে। ত্রিশূলধারী ভৈরব নাগমহাশয়কে দেখিয়াই গাঁজার পয়সা দাবি করিল। নাগমহাশয় সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন, "আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন, কিন্তু হিন্দুর কুলবতী যুবতী স্ত্রীকে ভৈরবী সাজাইয়া রাজপথে চলাফেরা কোন্ শাস্ত্রমতে করিতেছেন, আমাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।" তাহাতে উগ্রভৈরব আরও উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিল, "কিছু না দাও ত না দেবে, কিন্তু অমন করে গাল দেবার তোমার প্রয়োজন কি?" ভৈরব-ভৈরবী চটিয়া চলিয়া গেল। নাগমহাশয় ভাবিতে লাগিলেন, "ভাল গুরু না হইলে লোকের এইরূপ দুর্দ্দশা

হয়; আপনিও মজে, পরকেও মজায়।" তিনি বলিতেন, "না বুঝিয়া লোকে যাহা করে, তাহার ক্ষমা আছে; কিন্তু ধর্মের ভান করিয়া লোক যদি কপটী ও ব্যভিচারী হয়, কল্পক্ষয়েও তাহার উদ্ধার হওয়া কঠিন।"

একবার এক অপরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ীতে তাঁহার ডাক হয়। নাগমহাশয় উপস্থিত হইলে সে ব্যক্তি একটি পরমা সুন্দরী যুবতী বিধবাকে দেখাইয়া তাহার গর্ভ নষ্ট করিয়া দিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করে। শুনিয়া নাগমহাশয় ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, "একে ত কোন ভদ্রলোকের কুলে কালি দিয়া মেয়েটিকে বাহির করিয়া আনিয়াছেন—এই এক মহাপাপ। তার উপর আবার ভ্রূণহত্যা করিতে উদ্যত হইয়া মহাপাতকে লিপ্ত হইতেছেন!" তিনি বিস্তর বুঝাইলেন, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। লোকটি তাঁহাকে অর্থের প্রলোভন দেখাইয়া জিদ করিতে লাগিল। নাগমহাশয় চলিয়া আসিলেন। হায়! এই মহাপাপ-নিবারণের কি উপায় নাই? ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য শিবনাথের বক্তৃতাদি শুনিয়াছেন। নাগমহাশয় ভাবিলেন —শিবনাথ ধার্ম্মিক এবং একজন প্রতিষ্ঠাবান লোক। তাঁহাকে বলিলে এই পাপকার্য্যের প্রতিবিধান হইতে পারে। শিবনাথবাবুর কাছে গেলেন। সমস্ত শুনিয়া শিবনাথ নাগমহাশয়কে দুই-একজন ব্রাহ্মের নাম বলিয়া দিলেন এবং তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া আইনানুসারে কার্য্য করিতে উপদেশ দিলেন। ব্রাহ্মগণের সহিত পরামর্শও নিষ্ফল হইল। শেষে নাগমহাশয় ভাবিলেন—"আমিই আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখি।" পরদিন সেই ভদ্রলোকের বাড়ী

গিয়া দেখেন, তাহারা কাশীধামে পলাইয়া গিয়াছে। পাপকার্য্যের কোন প্রতিকার করিতে পারিলেন না ভাবিয়া নাগমহাশয় অনেক দিন পর্য্যন্ত সন্তপ্ত ছিলেন এবং মাঝে মাঝে আক্ষেপ করিতেন।

আর্থিক উন্নতি হইলেও দীনদয়াল বাসায় পাচক ব্রাহ্মণ রাখিতেন না। নিজেই রাঁধিতেন। পুত্রের ইচ্ছা—পিতাকে রাঁধিতে না দিয়া তিনি রাঁধেন। সেই জন্য সুযোগ পাইলেই রাঁধিতে বসিতেন। দীনদয়ালের তাহাতে বিষম রাগ হইত। সতর্ক থাকিতেন—যাহাতে পুত্র আর সুযোগ না পান। পুত্রও তেমনি তক্কে তক্কে ফিরিতেছেন। এই রন্ধনব্যাপার লইয়া পিতাপুত্রে প্রায়ই কথান্তর হইত। বাসায় সেই সময় যদি কোন ভদ্রলোক উপস্থিত থাকিতেন, তিনি মধ্যস্থতা করিয়া সেদিনকার মত বিবাদ মিটাইয়া দিতেন। কিন্তু দিলে কি হইবে, পরদিন আবার তাই। দুজনেই প্রাতঃকাল হইতে মনে মনে আঁচিতেছেন—আজ আমি রাঁধিব। যিনি সুযোগ পাইতেন, তিনি বসিয়া যাইতেন, কিন্তু যাঁহার মনোরথ বিফল হইত, তাঁহার আর ক্রোধের পরিসীমা থাকিত না। নিত্য এইরূপ বাদবিসংবাদ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য নাগমহাশয় স্থির করিলেন—পরিবারকে কলিকাতায় আনিয়া রাখিবেন। সুরেশবাবুর বাটীর নিকট একখানি দ্বিতল বাটী ভাড়া লওয়া হইবে, কেননা খোলার ঘরে স্থান সঙ্কীর্ণ। ১৮৮০ সালে মাঠাকুরাণী স্বামী ও শ্বশুরের সেবা করিবার জন্য কলিকাতায় আসিলেন। সংসারে এই তাঁহার প্রথম পদক্ষেপ। দেশে থাকিতে যে বধূর স্বামীর সহিত দেখা হয় নাই, এমন নহে। কিন্তু সে এক, এই আর! তখন ছিলেন বধূ, এখন গৃহিণী। নবীনা

গৃহিণী প্রবীণার ন্যায় সংসারের সকল কার্য্য ও স্বামি-শ্বশুরকে যত্ন করিতে লাগিলেন। দীনদয়াল সুখী হইলেন বটে, কিন্তু প্রাণপণ করিয়াও বধূ স্বামীর চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিলেন না। পতির শাস্ত্রপাঠে যে অনুরাগ তাহার শতাংশের একাংশও তাঁহার উপর নাই। চিকিৎসা করিয়া যে সময় যায়, নাগমহাশয় অবশিষ্ট কালটুকু ভাগবতপুরাণ-পাঠে অতিবাহিত করেন। কখন কখন দীনদয়ালকে পড়িয়া শুনান। বধূর চিত্ত দিন দিন অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল।

ভাগবতের ভবাটবীর বর্ণনা ও জড়ভরতোপাখ্যান নাগমহাশয়ের মনের উপর বড় প্রবল আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিল। জডভরতের কথা পড়িতে পড়িতে তিনি অভিভূত হইয়া ভাবিতেন, সামান্য হরিণশিশুর মায়ায় অতবড় মুক্তপুরুষের যখন জন্মান্তর-গ্রহণ করিতে হইল, তখন সাধারণ জীবের পক্ষে আর কি কথা! মায়ার অনির্ব্বচনীয় অচিন্তনীয় শক্তি ভাবিতে ভাবিতে ভীতিবিহ্বল চিত্তে তিনি কেবল "মাগো, মাগো" করিতেন। চিন্তা ক্রমে ঘোরতর হইয়া উঠিল। কিসে মহামায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবেন, কি উপায়ে সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবেন—অহর্নিশ এই ভাবনা। বিবাহ করিয়াছেন, অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন, বন্ধনের উপর বন্ধন বাড়িতেছে,—মুক্তির উপায় কি? ব্যাকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। যখন চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন, ভাবিয়াছিলেন দীন-দুঃখীর উপকার হইবে। অক্লান্তযত্নে রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছেন, অকাতরে দান করিয়াছেন, কতদিন মুখের গ্রাস ক্ষুধাতুরকে ধরিয়া দিয়াছেন, কিন্তু হায়, কয়জনের দুঃখ দূর হইয়াছে! তবে এ দুঃখপূর্ণ সংসারে কেন

আসিলাম? আবার বিড়ম্বনার উপর বিড়ম্বনা! বিবাহ করিলাম কেন? ছাই টাকা! ছাই মেয়েমানুষ! এই লইয়া কি জীবন কাটাইব, না ভগবানকে প্রত্যক্ষ করিয়া নরজন্ম সার্থক করিব? কি সাধনা করিলে, কোন মহাপুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করিলে ভগবানকে প্রত্যক্ষ করা যায়? এই ভাবনায় নাগমহাশয়ের মন নিতান্ত অশ্রান্ত হইয়া উঠিল।

এই সময় সুরেশ ও আর কয়েক জন ব্রাহ্ম ভদ্রলোক একত্র হইয়া গঙ্গাতীরে উপাসনা করিতেন। নাগমহাশয় সেখানে এক পাশে বসিয়া ধ্যান করিতেন। উপাসনার অন্তে কোন দিন ব্রহ্মসঙ্গীত, কোনদিন কীর্ত্তন হইত। কীর্ত্তনের সঙ্গে নাগমহাশয় নৃত্য করিতেন। ভাবাবেশে মত্তভাবে নৃত্য করিতে করিতে এক এক দিন পড়িয়া গিয়া তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইত। একদিন গঙ্গার গর্ভে পড়িয়া যান। সুরেশ অপর এক ব্যক্তি-সহায়ে তাঁহাকে উদ্ধার করেন। কিন্তু সকল দিন তাঁহার এরূপ মত্তভাব দেখা যাইত না। ভাবসংবরণে নাগমহাশয় অতিশয় দক্ষ ছিলেন। তিনি বলিতেন, "যত থাকে গুপ্ত, তত হয় পোক্ত। আর যত হয় ব্যক্ত, তত হয় ত্যক্ত।" সুরেশ বলেন, ভাবোন্মত্ততার সময়ে প্রবল ঈশ্বরানুরাগের লক্ষণসকল নাগমহাশয়ের শরীরে সুস্পষ্টভাবে প্রকটিত হইত। "দেখাতেই দীক্ষা, শোনাতেই শিক্ষা।"

কিন্তু যতই বিশ্বাস-অনুরাগ থাক, বিধিপূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করিয়া সাধন-ভজন না করিলে ইষ্টদর্শন হয় না—এক সাধুর মুখে এই কথা শুনিয়া নাগমহাশয় দীক্ষাগ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়া

উঠিলেন। তাঁহার দারুণ অশান্তি উপস্থিত হইল। কোথায় গুরু পাইবেন, কে তাঁহাকে মন্ত্র দিবে—নিরন্তর এই ভাবনা। গঙ্গাকূলে সময় সময় অনেক সাধুসজ্জনের সমাগম হয়, তাঁহাদের মধ্যে যদি কেহ দয়াপরবশ হইয়া তাঁহাকে দীক্ষা দান করেন—এই আশায় তিনি অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত গঙ্গাতীরে বসিয়া থাকিতেন। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে নাগমহাশয় একদিন কুমারটুলীর ঘাটে স্নান করিতে করিতে দেখিলেন, একটিমাত্র আরোহী লইয়া একখানি একমাল্লাই ডিঙ্গি ঘাটের দিকে আসিতেছে। বিক্রমপুরী ডিঙ্গি তাঁহার কৌতূহল আকর্ষণ করিল। ঘাটে লাগিলে দেখিলেন, নৌকার আরোহী তাঁহাদেরই কুলগুরু কামারখাড়াবাসী বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্য! নাগমহাশয় তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া উঠিয়া গুরুদেবের পদধূলি লইয়া হঠাৎ নৌকাযোগে তাঁহার কলিকাতায় আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বঙ্গচন্দ্র বলিলেন, "বাবা, মহামায়ার আদেশে তোমাকে মন্ত্রদীক্ষিত করিতেই এখানে আসিয়াছি।" নাগমহাশয় বুঝিলেন—তাঁহার কাতর প্রার্থনা করুণাময়ী জগজ্জননীর কর্ণগোচর হইয়াছে। তাঁহার বাসা তখন কাশীমিত্রের গলিতে; পরমানন্দে বঙ্গচন্দ্র ভট্টাচার্য্যকে তথায় লইয়া গেলেন। কুলগুরুকে দেখিয়া দীনদয়ালেরও আহ্লাদের অবধি রহিল না, কারণ তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ধর্ম্মোন্মাদ পুত্র কুলগুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করে। পরদিন শুভদিন ছিল, নাগমহাশয় সস্ত্রীক শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। ডিঙ্গি কুমারটুলীর ঘাটে অপেক্ষা করিতেছিল। যেদিন নাগমহাশয়ের দীক্ষা হইল, তাহার তিন-চার দিন পরে বঙ্গচন্দ্র বিক্রমপুর রওনা

হইলেন। কয়েক দিন বিশ্রাম করিবার জন্য দীনদয়াল ও নাগমহাশয় তাঁহাকে বিস্তর মিনতি করিলেন, কিন্তু বঙ্গচন্দ্র রহিলেন না। মাতৃঠাকুরাণীর মুখে অবগত হইয়াছি বঙ্গচন্দ্র কৌলসন্ন্যাসী ছিলেন। নাগমহাশয়ের দীক্ষার পর বৎসরান্তে তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

দীক্ষা গ্রহণ করিয়া নাগমহাশয় সাধনার অগাধ সলিলে আপনাকে ডুবাইয়া দিলেন। জপ-ধ্যানে রাত্রি পোহাইয়া যাইত। অমাবস্যায় উপবাস করিয়া গঙ্গাকূলে বসিয়া জপ করিতেন। জপ করিতে করিতে সময় সময় তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হইত। একদিন তিনি তন্ময় হইয়া জপ করিতেছিলেন, জোয়ার আসিয়া তাঁহার অচেতন দেহ ভাসাইয়া লইয়া যায়, সংজ্ঞা হইলে তিনি সাঁতার দিয়া উঠিয়া আসেন। চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির সঙ্গে আহারের হ্রাস-বৃদ্ধি করিয়া নাগমহাশয় কিছুকাল নক্তব্রত আচরণ করিয়াছিলেন। সুরেশ বলেন, নাগমহাশয় তন্ত্রমতেও সাধনা করিতেন। তিনি কখন ফুল-বিল্বদলে বাহ্যপূজা করেন নাই। দীক্ষা-গ্রহণান্তে জপ তপ ধ্যান করিতেন, কিন্তু তাঁহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রাগমার্গে। এই সময় নাগমহাশয় অনেকগুলি শ্যামাবিষয়ক পদাবলী রচনা করেন। জপ-ধ্যানান্তে কখন কখন তাহার কোন কোনটি গান করিতেন। গ্রন্থশেষে আমরা পাঠককে তাহার দুই চারিটি উপহার দিব।

ক্রমে ব্যবসায়ের পক্ষে ক্ষতি হইতে লাগিল। লোকে ডাকিতে আসে, পায় না,—অন্য চিকিৎসকের কাছে যায়। উপার্জ্জনের পন্থাও সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিল।

দীনদয়াল দেখিলেন, আবার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। সুরেশের সহিত পুত্রের সৌহৃদ্য হওয়াতে তিনি একপ্রকার নিশ্চিন্ত ছিলেন।

পিসীমাতার মৃত্যুর পর নাগমহাশয়ের মনে প্রথম যখন সংসার-বৈরাগ্যের উদয় হয়, দীনদয়াল ভাবিয়াছিলেন সুরেশের উপদেশেই তাহা দূর হইয়াছিল। সুরেশ ধার্ম্মিক এবং সৎ গৃহস্থ। এমন বিচক্ষণ ব্যক্তির সংস্রবে থাকিতে পুত্রের সে নির্ব্বাণোন্মুখ অনল যে পুনঃ প্রজ্বলিত হইবে, পিতার সে কথা মনেই হয় নাই। দীনদয়াল লোকের কাছে গর্ব্ব করিয়া বলিতেন, সুরেশের সহিত সৌহৃদ্যবন্ধন তাঁহার পুত্রের পক্ষে পরম কল্যাণকর হইয়াছে। এখন বুঝিলেন সুরেশ হইতে আর কোন ভরসা নাই। সংসারধর্ম্মে যাহাতে পুত্রের সুমতি হয়, নিরুপায় বৃদ্ধ বধূমাতাকে তৎসম্বন্ধে নানাবিধ উপদেশ দিতে লাগিলেন। হায়, বধূরই বা উপায় কি ? পতির মতি-গতি সতী পূর্ব্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন। সত্য বটে অন্ন-বস্ত্রের ক্লেশ নাই। সামান্য সংসার—পিতাপুত্রের উপার্জ্জনে এক রকম চলিয়া যায়; কিন্তু কেবল অন্ন-বস্ত্রে ত হৃদয়ের অভাব পূর্ণ হয় না। স্বামীর অনুরাগই নারীজীবনের একমাত্র অবলম্বন।

বৃদ্ধ পিতাকে অবসর দিয়া হাট-বাজার প্রভৃতি সংসারের সকল কায নাগমহাশয় করেন। কিন্তু প্রাণহীন পুত্তলিকা যেমন যন্ত্র-চালিত হইয়া হস্তপদ সঞ্চালন করে, নাগমহাশয়ের সকল কার্য্যই সেইরূপ। কিছুতে তাঁহার মন নাই। খাইতে হয় খান; না পরিলে নয় তাই পরেন; ডাক্তারি করেন, তাও দীনদয়ালের পীড়াপীড়িতে। বধূ নতশিরে দীনদয়ালের উপদেশ শুনিতেন, কিন্তু মনে মনে ভাবিতেন—এ গৃহবাসী সন্ন্যাসীকে বাঁধিতে পারে এমন রমণী এখনও জন্মগ্রহণ করে নাই। মায়িক ভালবাসা না থাকিলেও নাগমহাশয় নিয়ত সহধর্ম্মিণীর ইষ্টচিন্তা করিতেন। বধূকে তিনি

কেবলই বলিতেন, "কায়িক বা মায়িক সম্বন্ধ কখন চিরস্থায়ী হয় না। যে ভগবানকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে পারে, সেই নরজন্ম সার্থক করিয়া চলিয়া যায়। যাহারা এই মায়িক সম্বন্ধে একবার লিপ্ত হইয়া পড়ে, জন্মজন্মেও তাহাদের মোহ দূর হয় না। সংসার-নরকে তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতে হয়। ছাই এ হাড়মাঁসের খাঁচায় যেন বদ্ধ হইও না। আমাকে ভুলিয়া মহামায়ার শরণাপন্ন হও,—তোমার ইহকাল-পরকাল ভাল হইবে।" তাপসের গৃহিণী তপস্বিনী হইলেন।

মাঠাকুরাণী কলিকাতায় থাকাতে সুরেশের যাতায়াত একদিনও বন্ধ হয় নাই। তিনি এক এক দিন নাগমহাশয়ের বাসায় আহারাদি করিতেন। সুরেশ বলেন, "পরিবার আসিলেও নাগমহাশয়ের ধর্ম্মভাবের কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। দেবতা চিরদিনই দেবতা; শত প্রতিকূল অবস্থায়ও তাঁহার দেবত্ব নষ্ট হয় না। নাগমহাশয়ও ঠিক তেমনি ছিলেন। পরিবার বলিয়া তাঁহার কোন আঁট ছিল না।"

নাগমহাশয় ক্রমেই উগ্র হইতে উগ্রতর সাধনায় নিমগ্ন হইতে লাগিলেন। এইদিকে দীনদয়ালের শরীরও ক্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। বৃদ্ধবয়সে দীনদয়াল পালবাবুদের অধীনে কুতের কার্য্য করিতেন; তিনি দেশে গেলে নাগমহাশয় পিতার কার্য্য চালাইতেন। এইরূপে কিছুদিন কাটিল, কিন্তু দীনদয়ালের দেহ আর বয় না। নাগমহাশয়ের একান্ত ইচ্ছা—পিতা এখন কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া দেশে বসিয়া ইষ্টচিন্তা করেন। অবশ্য কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করাইয়া কলিকাতায় নিজের কাছে রাখিতে পারেন। সেবা-শুশ্রূষার

জন্য বধূ রহিয়াছেন। কিন্তু কলিকাতায় থাকিলে পিতার ইষ্টচিন্তায় বড় ব্যাঘাত। দীনদয়ালের নিকট নানা প্রকৃতির লোক আসিত, নানা বিষয় লইয়া নানা কথা কহিত। দীনদয়ালও তাহাদের সহিত বিবিধ আলোচনা করিতেন। সকালে দীনদয়াল সকল কার্যের অগ্রে দুর্গানাম লিখিতেন, কিন্তু দুর্গানাম লিখিতে লিখিতে উপস্থিত ব্যক্তিগণের সহিত কথাবার্ত্তাও কহিতেন। পুত্রের তাহা বড়ই বিসদৃশ বোধ হইত। পিতাকে বলিতেন, "এখনও বিষয়চিন্তা ত্যাগ করিতে পারেন নাই, দুর্গানাম লিখিতে লিখিতে আবার বিষয়ের আলাপ!" মধ্যে মধ্যে প্রায়ই পিতা-পুত্রে এইরূপ কথান্তর হইত। অবশেষে নাগমহাশয় স্থির করিলেন, পিতাকে দেশে পাঠাইবেন। দীনদয়ালের প্রতিনিধিস্বরূপ কুতের কার্য্যের ভার লইয়া নাগমহাশয় তাঁহাকে দেশে রাখিয়া আসিলেন। শ্বশুরের সেবাশুশ্রূষা করিবার জন্য বধূও সঙ্গে গেলেন।

দীনদয়াল ও বধূ দেশে গেলে নাগমহাশয় কুমারটুলীর বাসায় আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সুরেশ তেমনি নিত্য আসেন, আর দুইজনে নির্ঝঞ্ঝাটে বসিয়া ধর্ম্মকথার আলোচনা হয়। কিন্তু কেবল আলোচনায় আর নাগমহাশয়ের তৃপ্তি হইতেছে না। বলিতে লাগিলেন, "কেবল কথায় কথায় জীবন ত চলিয়া যাইতেছে, কিছু প্রত্যক্ষ না দেখিলে জীবনধারণ করা নিষ্ফল হইল!" ঠিক এই সময় সুরেশ একদিন কেশববাবুর সমাজে গিয়া শুনিলেন যে, দক্ষিণেশ্বরে একজন সাধু আছেন—তিনি কামকাঞ্চনত্যাগী, ভগবৎপ্রসঙ্গে সর্বদা তন্ময় হইয়া থাকেন, এবং তাঁহার মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধি হয়। সুরেশের ইচ্ছা হইল, নাগমহাশয়কে সঙ্গে লইয়া একদিন সাধুকে দেখিতে

যাইবেন। কিন্তু নানা কারণে সে কথা নাগমহাশয়কে বলা হইল না। এইরূপে দুই মাস কাটিয়া গেল। তাহার পর সুরেশ একদিন নাগমহাশয়কে বলিলেন, "ওহে, দক্ষিণেশ্বরে একজন খুব ভাল সাধু আছেন, দেখতে যাবে ?" নাগমহাশয়ের আর বিলম্ব সহিল না,—বলিলেন, "আজই চল।" সেইদিনই দুইজনে আহারাদি করিয়া বাহির হইলেন। শুনিয়াছিলেন—দক্ষিণেশ্বর কলিকাতার উত্তরে; সেই মুখেই চলিতে লাগিলেন। তখন চৈত্রমাস। মাথার উপর অগ্নিবর্ষণ হইতেছে। আকাশ, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী—সমস্ত অগ্নিময়। গ্রাহ্য নাই, দুই জনে যেন মাতোয়ারা হইয়া চলিতেছেন, কি এক অদৃশ্য শক্তি তাঁহাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে! দক্ষিণেশ্বর কতদূর জানা নাই, উভয়ে একাগ্রমনে উত্তরমুখে চলিতে লাগিলেন। বহুদূর গিয়া একজন পথিককে জিজ্ঞাসা করিলেন। পথিক বলিল, "আপনারা দক্ষিণেশ্বর ছাড়াইয়া আসিয়াছেন।" সে পথ বলিয়া দিল। দুই জনে প্রায় দুইটার সময় দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির কালীবাড়ীতে প্রবেশ করিলেন।

কি মনোহর স্থান! যেন দেবগণের নিভৃত লীলাভূমি! সংসারের কোলাহল নাই। মধুর পুষ্প-সৌরভে সমস্ত উদ্যানখানি যেন বিভোর হইয়া রহিয়াছে। কি স্নিগ্ধ বাতাস! কি সুন্দর পুষ্করিণী! কোথাও উচ্চশির দেবমন্দির; কোথাও নবপল্লবিত বৃক্ষরাজি যেন শাখা আন্দোলন করিয়া ধীরস্বরে ডাকিতেছে—আইস আইস, সংসার-সন্তপ্ত পথিক, এই তোমার জুড়াইবার স্থান!

দেখিতে দেখিতে দুই জনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যে প্রকোষ্ঠে থাকিতেন, তাহার পূর্ব্বদিকের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

দ্বারপার্শ্বে একজন শ্মশ্রুধারী পুরুষ বসিয়াছিলেন, নাগমহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাশয়, এখানে যে একজন ব্রহ্মচারী থাকেন তিনি কোথায়?" ভদ্রলোকটি বলিলেন, "হাঁ, একজন আছেন। তিনি আজ চন্দননগরে গিয়াছেন। তোমরা আর একদিন এস।"

এত কষ্ট করিয়া আসিয়াছেন, উত্তর শুনিয়া দুইজনের মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইল। হতাশায় যেন অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। কি আর উপায়! ভদ্রতার খাতিরে ভদ্রলোকটিকে একটি কথা বলিয়া বিদায় লইবার উদ্যোগ করিতেছেন, নাগমহাশয় দেখিলেন, দ্বারের অন্তরাল হইতে অঙ্গুলীসঙ্কেত করিয়া কে যেন তাঁহাদিগকে আহ্বান করিতেছেন। নাগমহাশয়কে কে যেন বলিয়া দিল, ইনিই সেই সাধু! শ্মশ্রুধারীর বাক্য উপেক্ষা করিয়া দুইজনে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

শ্মশ্রুধারী ভদ্রলোকটির নাম প্রতাপচন্দ্র হাজরা। নাগমহাশয় বলিতেন—হায়, হায়, ভগবানের কি আশ্চর্য মায়া! বার বৎসর কাল নিকটে অবস্থান করিয়াও হাজরা মহাশয় ঠাকুরকে চিনিতে পারেন নাই। ফুট তাঁর হাতে, তিনি কৃপা করিয়া জানাইয়া দিলে তবে জীব তাঁহাকে জানিতে পারে। শত বৎসর জপ-ধ্যান করিলেও তাঁর কৃপা না হইলে কেহই তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হয় না।

শ্রীরামকৃষ্ণের নিজ জীবনের ঘটনা হইতে স্বামী সুবোধানন্দ শেষোক্ত কথার একটি উদাহরণ দেন: ভাগিনেয় হৃদয় মুখোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন কালীঘাটে গমন করেন। শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদিকে যে পুষ্করিণী আছে, তাহার

উত্তরপাড়ে বিস্তর কচুগাছের বন ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিলেন—সেইখানে শ্রীশ্রীজগন্মাতা একখানি লালপেড়ে কাপড় পরিয়া কুমারীবেশে কতকগুলি কুমারীর সহিত ফড়িং ধরিয়া খেলা করিতেছেন। দেখিয়াই ঠাকুর 'মা মা' বলিয়া সমাধিস্থ হইলেন এবং সমাধিভঙ্গের পর শ্রীমন্দিরে গিয়া দেখিলেন—যে কাপড় পরিয়া মা কুমারীবেশে খেলা করিতেছিলেন, শ্রীবিগ্রহের অঙ্গে সেই শাড়ী শোভা পাইতেছে। ঠাকুরের মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া হৃদয় বলিলেন, "মামা, তখনই বলতে হয়, মাকে গিয়ে দৌড়ে ধরে ফেলতুম।" ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "তা কি হয় রে! মা না ধরা দিলে কার সাধ্য যে তাঁকে ধরতে পারে! তাঁর কৃপা না হলে কেউ তাঁর দর্শন পায় না।"

প্রথমদিন হইতেই হাজরা মহাশয়ের উপর নাগমহাশয়ের কেমন বিরূপভাব হইয়াছিল। বলিতেন—"ঠাকুরের কাছে থাকিয়াও তাঁহার সত্যের আঁট ছিল না, মিথ্যাকথা বলিয়া প্রথম দিনেই তিনি আমাদিগকে তাড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু দয়াময় রামকৃষ্ণ নিজগুণে পাদপদ্মে আশ্রয় দিলেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-দর্শন

নাগমহাশয় ও সুরেশ কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ উত্তরাস্য হইয়া একখানি ছোট তক্তাপোশের উপর পা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন; মুখে মৃদু হাসি। সুরেশ করযোড়ে প্রণাম করিয়া মেজেতে পাতা মাদুরের উপর বসিলেন। নাগমহাশয় ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন, কিন্তু পদধূলি লইবার চেষ্টা করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ চরণ স্পর্শ করিতে দিলেন না—পা গুটাইয়া লইলেন। নাগমহাশয় বুঝিলেন, তিনি এখনও এই পবিত্র সাধুর চরণ স্পর্শ করিবার যোগ্য হন নাই। উঠিয়া ঘরের এক পাশে বসিলেন।

ঠাকুর উভয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন,—কি নাম, কোথায় বাড়ী, কি করা হয়, সংসারে আর কে কে আছে, বিবাহ হয়েছে কি না, ইত্যাদি। তাহার পর কথা কহিতে কহিতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, "সংসারে থাকবে ঠিক পাঁকাল মাছের মত। গৃহে থাকা, তার আর দোষ কি? পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে, কিন্তু গায়ে পাঁক লাগে না। তেমনি গৃহে থাকবে, কিন্তু সংসারের ময়লা মনে লাগবে না।" নাগমহাশয় একদৃষ্টে ঠাকুরের মুখপানে চাহিয়া ছিলেন; ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমন করে কি দেখছ?"

নাগমহাশয়—আপনাকে দেখতে এসেছি তাই দেখছি।

কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিবার পর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "ঐদিকে পঞ্চবটীতে গিয়ে একটু ধ্যান করে এস।"

প্রায় আধঘণ্টা ধ্যান করিয়া সুরেশ ও নাগমহাশয় আবার ঠাকুরের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর ঠাকুর তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া দেবমন্দিরসকল দেখাইতে গেলেন।

ঠাকুর অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন, সুরেশ ও নাগমহাশয় পশ্চাতে। প্রথমেই ঠাকুরের ঘরের সংলগ্ন দ্বাদশ শিবমন্দির। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রত্যেক মন্দিরে প্রবেশ করিয়া যেমন ভাবে শিবলিঙ্গ প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে নাগমহাশয়ও তেমন করিয়া প্রণাম-প্রদক্ষিণ করিলেন। সুরেশ ব্রহ্মজ্ঞানী, ঠাকুর-দেবতা মানেন না,—নিস্তব্ধ হইয়া দেখিতে লাগিলেন। তাহার পর বিষ্ণুমন্দির। এখানেও পূর্ব্ববৎ প্রণাম-প্রদক্ষিণাদি করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

নাগমহাশয় ও সুরেশ বিস্মিত হইয়া দেখিলেন—শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে প্রবেশ করিবামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবান্তর হইল। অশান্ত বালক যেমন জননীর অঞ্চল ধরিয়া তাঁহার চারিদিকে ঘুরিতে থাকে, শ্রীশ্রীভবতারিণীকে শ্রীরামকৃষ্ণ তেমনি করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর শ্রীশ্রীমহাদেব ও শ্রীশ্রীমায়ের পাদপদ্ম মস্তকে স্পর্শ করিয়া, প্রণাম করিয়া ঠাকুর নিজ কক্ষে আসিয়া বসিলেন।

বেলা প্রায় ৫টার সময় সুরেশ ও নাগমহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ-সকাশে বিদায় চাহিলেন। ঠাকুর বলিলেন, "আবার এস, এলে-গেলে তবে ত পরিচয় হবে।"

পথে আসিতে আসিতে নাগমহাশয়ের কেবলই মনে হইতে লাগিল—কে ইনি? সাধু সিদ্ধ মহাপুরুষ, না আরও কিছু?

সুরেশ বলেন, "সেদিনকার সে ভাব-ভক্তির ছবি তাঁহার হৃদয়ে চিরাঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে।" আহুতি পাইলে অনল যেমন জ্বলিয়া উঠে, নাগমহাশয়ের হৃদয়ে তেমনি তীব্র পিপাসা জাগিয়া উঠিল,—ঈশ্বরলাভ-লালসায় তিনি পাগল হইয়া উঠিলেন। আহার-নিদ্রা একপ্রকার ত্যাগ এবং লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তাও বন্ধ হইল; কেবল সুরেশের সঙ্গে 'শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ' করিতেন।

প্রায় সপ্তাহ পরে আবার দুই জনে ঠাকুরকে দেখিতে গেলেন। উন্মাদপ্রায় নাগমহাশয়কে দেখিবামাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবেশ হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "এসেছিস, তা বেশ করেছিস; আমি যে তোদের জন্য এতদিন হেথায় বসে রয়েছি!" তাহার পর নাগমহাশয়কে কাছে বসাইয়া বলিলেন, "ভয় কি? তোমার ত খুব উচ্চ অবস্থা।" সেদিনও শ্রীরামকৃষ্ণ নাগমহাশয় ও সুরেশকে পঞ্চবটীতে গিয়া ধ্যান করিতে বলিলেন। তাঁহারা ধ্যান করিতে গেলে কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর সেখানে আসিয়া নাগমহাশয়কে তামাক সাজিয়া আনিতে আদেশ করিলেন। নাগমহাশয় তামাক সাজিতে যাইলে শ্রীরামকৃষ্ণ সুরেশকে বলিলেন, "দেখেছিস, এ লোকটা যেন আগুন—জ্বলন্ত আগুন।" বলিতে বলিতে নাগমহাশয় তামাক সাজিয়া আনিলেন। তামাক সাজিবার পর, ঠাকুর তাঁহাকে ক্রমান্বয়ে আদেশ করিতে লাগিলেন—"গামছা ও বেটুয়াটি আন," "এবার গিয়া জলের গাড়ুটি নিয়ে এস," "জল ভর্ত্তি করে নিয়ে এস" ইত্যাদি। শ্রীরামকৃষ্ণকে সেবা করিতে পাইয়া নাগমহাশয়ের আনন্দের অবধি রহিল না। কেবল মনে এক ক্ষোভ—ঠাকুর পদধূলি দেন নাই।

ইহার পর নাগমহাশয় যেদিন দক্ষিণেশ্বরে গেলেন, সেদিন একা। সুরেশ কার্যান্তরে ব্যস্ত ছিলেন, যাইতে পারেন নাই। সেদিনও নাগমহাশয়কে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাবেশ হইল। বসিয়াছিলেন, বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে বলিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঠাকুরকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া নাগমহাশয়ের বিষম ভয় হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিলেন, "ওগো, তুমি না ডাক্তারি কর, দেখ দিকি আমার পায়ে কি হয়েছে?" ঠাকুরের স্বাভাবিক কথা শুনিয়া নাগমহাশয় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেন; পায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "কই, কোথাও ত কিছু দেখছি না।" শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "ভাল করে দেখ না, কি হয়েছে।" নাগমহাশয়ের হৃদয়ের ক্ষোভ আজ দূর হইল, চরণস্পর্শের অধিকার পাইয়া আপনাকে ধন্য মনে করিয়া অশ্রুজলে ভাসিতে ভাসিতে বারবার সে বাঞ্ছিত চরণ হৃদয়ে মস্তকে ধারণ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন, "তাঁহার (ঠাকুরের) নিকট কিছুই চাহিবার প্রয়োজন ছিল না; তিনি মনের ভাব বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ অভীষ্ট পূর্ণ করিয়া দিতেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ কল্পতরু, যে যাহা প্রার্থনা করিয়াছে, সে তৎক্ষণাৎ তাহা লাভ করিয়াছে।"

এখন হইতে নাগমহাশয়ের ধ্রুব ধারণা হইল, শ্রীরামকৃষ্ণ সাক্ষাৎ নারায়ণ। তিনি বলিতেন, "ঠাকুরের নিকট কয়েক দিন যাতায়াতের পর জানিতে পারিলাম, ইনিই সাক্ষাৎ নারায়ণ; গোপনে দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া লীলা করিতেছেন।" "কেমন করিয়া জানিলেন?" জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, "তিনিই (ঠাকুরই) যে নিজগুণে কৃপা করে জানিয়ে দিলেন 'তিনি কে'। তাঁর কৃপা

না হলে কি কেউ তাঁকে জানতে পারে, না বুঝতে পারে! সহস্র বর্ষ কঠোর তপশ্চর্যা করলেও যদি ভগবানের কৃপা না হয়, তবে কেউই তাঁকে বুঝতে সমর্থ হয় না।"

ইহার পর শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন তাঁহাকে নিজ দেহ দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার এটা কি বোধ হয়?" নাগমহাশয় করজোড়ে বলিলেন, "ঠাকুর, আর আমায় বলতে হবে না! আমি আপনারই কৃপায় জানতে পেরেছি—আপনি সে-ই।" ঠাকুর অমনি সমাধিস্থ হইয়া নাগমহাশয়ের বক্ষে দক্ষিণ চরণ অর্পণ করিলেন। সহসা নাগমহাশয়ের যেন কি একরূপ ভাবান্তর হইল, তিনি দেখিলেন—সমস্ত স্থাবর জঙ্গম চরাচরে কি এক দিব্য জ্যোতি উছলিয়া উঠিতেছে!

তিনি বলিতেন, "ঠাকুরের আগমন অবধি জগতে বন্যা এসেছে, সব ভেসে যাবে, সব ভেসে যাবে! শ্রীরামকৃষ্ণ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, এমন সর্বভাবের সমন্বয় আজ পর্যন্ত কোন অবতারে হয় নি।"

কিছুকাল এইরূপ যাতায়াত করিবার পর একদিন নাগমহাশয় দক্ষিণেশ্বরে গিয়া দেখেন, শ্রীরামকৃষ্ণ আহারান্তে বিশ্রাম করিতেছেন। তখন জ্যৈষ্ঠমাস, আর সেদিন ভারি গ্রীষ্ম। নাগমহাশয়ের হাতে পাখাখানি দিয়া ঠাকুর ঘুমাইলেন। কিছুক্ষণ বাতাস করিতে করিতে নাগমহাশয়ের হাত অত্যন্ত ভারিয়া উঠিল, কিন্তু ঠাকুরের আদেশ ব্যতীত তিনি বাতাস বন্ধ করিতে পারিলেন না। ক্রমে হাত এতই ভারিয়া উঠিল যে আর চলে না! শ্রীরামকৃষ্ণ অমনি তাঁহার হাত ধরিয়া বাতাস বন্ধ করিলেন। নাগমহাশয় বলিতেন, "ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধারণের ন্যায় নিদ্রাবস্থা নহে! তিনি

সদাসর্বদা জাগরিতই থাকিতেন। এক ভগবান ভিন্ন সাধক বা সিদ্ধপুরুষে এ অবস্থা কদাপি সম্ভবপর হইতে পারে না।"

একদিন নাগমহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণের কক্ষে বসিয়া ছিলেন; "চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং" বলিতে বলিতে স্বামী বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্র) প্রবেশ করিলেন। ঠাকুর নাগমহাশয়কে দেখাইয়া নরেন্দ্রকে বলিলেন, "এই এরই ঠিক ঠিক দীনতা, একটুও ভান নেই।" নরেন্দ্র বলিলেন, "তা আপনি যখন বলছেন, তা হবে।" দুইজনে আলাপ হইতে লাগিল।

কথায় কথায় নাগমহাশয় বলিলেন—

"সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।"

নরেন্দ্র—আমি 'তিনি-মিনি' বুঝি না। আমি প্রত্যক্ষ পরমাত্মা। আমার ভিতর নিখিল ব্রহ্মাণ্ড—উঠছে, ভাসছে, ডুবছে!

নাগমহাশয়—আপনার কি সাধ্য যে একটি চুল সোজা করেন, তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ত দূরের কথা। তাঁর ইচ্ছা না হলে গাছের পাতাও নড়ে না!

নরেন্দ্র—আমি ইচ্ছা না করলে চন্দ্র-সূর্যের গতিরোধ হয়। আমার ইচ্ছায় এই বিরাট ব্রহ্মাণ্ড যন্ত্রবৎ পরিচালিত হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছোট তক্তাপোশে বসিয়া উভয়ের কথা শুনিতেছিলেন, তিনি হাসিতে হাসিতে নাগমহাশয়কে বলিলেন, "কি জানিস, ও খাপ-খোলা তরোয়াল, ওর ও-কথা শোভা পায়, তা নরেন ও-কথা বলতে পারে।" নাগমহাশয়ের অমনি ধারণা হইল—নরেন্দ্রনাথ মানুষ নহেন, রামকৃষ্ণ-লীলায় মহাদেব নরশরীরে অবতীর্ণ

হইয়াছেন। নরেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিয়া নিরুত্তর হইলেন। জীবনে আর তাঁহার বিশ্বাস পরিবর্তিত হয় নাই। কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোক একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কোন মুক্ত পুরুষ দর্শন করিয়াছেন কি?" নাগমহাশয় বলিয়াছিলেন, "সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা শ্রীরামকৃষ্ণদেবকেই দর্শন করিয়াছি। আর তাঁহার সর্বপ্রধান পার্ষদ শিবাবতার স্বামীজীকেও দর্শন করিয়াছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ যাহা কিছু বলিতেন, নাগমহাশয় তাহা বেদবাক্য-স্বরূপ গ্রহণ করিতেন। তিনি বলিতেন, "ঠাকুর পরিহাসচ্ছলেও যদি কোন কথা কহিতেন, তাহারও এক গূঢ় রহস্য থাকিত। আমি হাঁদা লোক, তাঁহাকে বুঝিলাম কৈ?"

কয়েক মাস দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিবার পর নাগমহাশয় একদিন শুনিলেন, ঠাকুর কোন ভক্তকে বলিতেছেন, "দেখ, ডাক্তার, উকীল, মোক্তার, দালাল এদের ঠিক ঠিক ধর্মলাভ হওয়া বড় কঠিন।" তাহার পর ডাক্তারদিগের সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া বলিলেন, "এতটুকু ওষুধে মন পড়ে থাকবে, তা হলে কি করে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডের ধারণা হতে পারবে?" ইহার কিছুদিন পূর্ব হইতে নাগমহাশয় দেখিতেন, তাঁহার চিকিৎসাধীন রোগীদের মূর্তি সর্বদাই তাঁহার চক্ষের সমক্ষে ফুটিয়া উঠিতেছে। ইহাতে তাঁহার ধ্যানের বড় ব্যাঘাত হইত। শ্রীরামকৃষ্ণের কথা শুনিয়া তিনি মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন, "যে বৃত্তি ঈশ্বরলাভের প্রবল অন্তরায় বলিয়া ঠাকুর নির্দেশ করিলেন, সে বৃত্তি দ্বারা অন্ন-বস্ত্রলাভের আমার প্রয়োজন নাই।" সেদিন বাসায় আসিয়া ঔষধের বাক্স ও চিকিৎসার পুস্তকাদি লইয়া গিয়া গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন।

তারপর গঙ্গাস্নান করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। কুতের কার্যই এখন তাঁহার একমাত্র জীবিকা হইল।

দীনদয়াল লোক-পরম্পরায় শুনিলেন—নাগমহাশয় ডাক্তারি ছাড়িয়া দিয়াছেন। তিনি মহা উদ্বিগ্ন হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। পিতার প্রতিনিধিস্বরূপ নাগমহাশয় এতদিন কুতের কার্য চালাইতে-ছিলেন। পালবাবুদের অনুরোধ করিয়া আপনার স্থলে পুত্রকে বাহাল করাইয়া দীনদয়াল দেশে গেলেন। কলিকাতায় এই তাঁহার শেষ আসা।

কুতের কার্যে নাগমহাশয়কে বেশী পরিশ্রম করিতে হইত না। কেবল কখন কখন বাগবাজার বা খিদিরপুরের খালে যাইতে হইত। ডাক্তারি ছাড়িয়া এখন জপতপেরও যেমন সুবিধা হইল, দক্ষিণেশ্বর যাইবারও তেমনি অবসর পাইলেন। বাসায় গঙ্গাজল রাখিবার একটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থান ছিল, সেইখানে জালার পাশে বসিয়া তিনি সর্বদা ধ্যান করিতেন। যেদিন কুতের কার্যের জন্য বাগবাজারে যাইতেন, সেদিন খাল পার হইয়া বন-বাগান-অঞ্চলে একটি নির্জন স্থান খুঁজিয়া লইতেন এবং সেইখানে বসিয়া ধ্যান করিতেন। একদিন এইরূপ ধ্যান করিতে করিতে তাঁহার কি অদ্ভুত দর্শনাদি হইয়াছিল বাসায় আসিয়া সুরেশকে বলিয়াছিলেন, ধ্যানে আর কখন তাঁহার তেমন আনন্দ হয় নাই।

ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট ঘন ঘন যাইতে যাইতে নাগমহাশয়ের অন্তরে অতি তীব্র বৈরাগ্যের সঞ্চার হইল। সংসার ত্যাগ করিবেন স্থির করিয়া অনুমতি লইতে দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। কিন্তু ঘরে প্রবেশ করিয়াই তিনি শুনিতে পাইলেন, ঠাকুর ভাবাবেশে

বলিতেছেন, "তা সংসার-আশ্রমে দোষ কি? তাঁতে মন থাকলেই হয়। গৃহাস্থাশ্রম কিরূপ জান? যেমন কেল্লার ভেতর থেকে লড়াই করা!" কি বিড়ম্বনা! যিনি স্ফুলিঙ্গে ফুৎকার দিয়া এই দাবানল জ্বালাইয়া তুলিয়াছেন, তিনিই বলিতেছেন, "তুমি জনকের মত গৃহস্থাশ্রমে থাকবে। তোমায় দেখে গৃহীরা যথার্থ গৃহস্থের ধর্ম শিখবে।" আর উপায় কি? নাগমহাশয় বলিতেন, "ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে যাহা একবার বাহির হইত, তাহার অন্যথা করিতে কাহারও শক্তি-সামর্থ্য ছিল না। যাহার যে পন্থা, দু কথায় তিনি তাহা বলিয়া দিতেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ শিরোধার্য করিয়া নাগমহাশয় বাসায় ফিরিলেন, কিন্তু মন বড় ব্যাকুল হইল। মুখে দিনরাত কেবল "হা ভগবান, হা ভগবান!" কখন ধূলায় আছড়াইয়া পড়েন, কখন বা কণ্টকে পড়িয়া শরীর ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। আহারে লক্ষ্য নাই; যেদিন সুরেশ যত্ন করিয়া কিছু খাওয়ান, সেইদিনই খাওয়া হয়, নইলে নয়। দিন কোথা দিয়া চলিয়া যায়, কখন কোথায় থাকেন, কিছুরই স্থিরতা নাই; বাসায় ফিরিতে কোন দিন রাত্রি দ্বিপ্রহর, কোন দিন দুইটা বাজে! সামান্য কুতের কার্য করাও নাগমহাশয়ের পক্ষে এখন দুষ্কর হইয়া উঠিল। কিছু পূর্বে রণজিৎ হাজরা বলিয়া এক ব্যক্তির সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল। রণজিৎ দরিদ্র সন্তান, কিন্তু অতি ধর্মভীরু; নাগমহাশয় যেদিন অক্ষম হইতেন, সে-ই তাঁহার হইয়া কুতের কার্য চালাইয়া দিত।

ইতোমধ্যে নাগমহাশয়কে একবার দেশে যাইতে হইল। মা ঠাকুরাণী তাঁহার অবস্থা দেখিয়া দারুণ শঙ্কিতা হইলেন। বুঝিলেন

গৃহস্থাশ্রমে স্বামীর আর তিলমাত্র আস্থা নাই। নাগমহাশয়ও তাঁহাকে বুঝাইলেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে অর্পিত দেহ দ্বারা তাঁহার আর সংসারের কোন কার্য হইবে না।"

নাগমহাশয়ের বাটীর পার্শ্বের একখানি জমিতে তাঁহার ভগ্নী সারদামণি একটি লাউগাছ লাগাইয়াছিলেন। গাছটি বেশ সতেজ হইয়া উঠিতেছিল। একদিন গাছের কাছে পাড়ার কোন লোক গরু বাঁধিয়া দিয়া যায়। কিন্তু দড়িটি এত ছোট করিয়া বাঁধিয়াছিল যে, গাভী লাউগাছটির লোভে বারবার তাহার সন্নিধানে যাইবার চেষ্টা করিলেও কিছুতেই কৃতকার্য হইতে পারিল না। নাগমহাশয় গাভীকে এইরূপ উপর্যুপরি বিফলমনোরথ হইতে দেখিয়া—'খাও মা, খাও' বলিয়া তাহার দড়িটি খুলিয়া দিলেন। গাভী মনের সাধে লাউগাছ খাইতে লাগিল। দীনদয়াল অবাক হইয়া পুত্রের কার্য দেখিলেন, তারপর ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "নিজে ত উপার্জন কর না। সংসারের যাহাতে হিত হয় সেরূপ করা দূরে থাক, এরূপ অনিষ্ট করা কেন?" পরে কথায় কথায় বলিলেন, "ডাক্তারি ছেড়ে দিয়ে ত বসলি, এখন কি খেয়ে কি করে দিন কাটাবি?"

নাগমহাশয়—যা হয় ভগবান করবেন, আপনি সেজন্যে ভাবনা করবেন না।

দীনদয়াল—হাঁ, তা জানি, এখন ন্যাংটা হয়ে চলবি, আর ব্যাঙ খেয়ে থাকবি।

নাগমহাশয় আর কোন উত্তর করিলেন না। পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া, উঠানে একটি মৃত ব্যাঙ পড়িয়াছিল তাহা

কুড়াইয়া আনিয়া খাইতে খাইতে পিতাকে বলিলেন, "এক্ষণে আপনার দুই আজ্ঞাই প্রতিপালন করিলাম। খাওয়া-পরার জন্য আর চিন্তা করিবেন না। আপনি বসিয়া বসিয়া কেবল ইষ্টনাম জপ করুন। আপনার পায়ে ধরিয়া বলিতেছি, এ বয়সে আর সংসারচিন্তা করিবেন না।" পুত্রকে উন্মাদ ভাবিয়া দীনদয়াল বধূকে বলিলেন, "আজ থেকে ওর মতের বিরুদ্ধে যেন কিছু না করা হয়।"

নাগমহাশয় যতদিন দেশে থাকিতেন, দীনদয়ালকে সংসারচিন্তা করিবার অবসর দিতেন না। সর্বদা তাঁহাকে শাস্ত্রপাঠ করিয়া শুনাইতেন। দীনদয়ালের কাছে যেসকল লোক গল্প-গুজব করিতে আসিত, নাগমহাশয় তাহাদিগকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেন, "আপনারা আসিয়া বাবার সঙ্গে আর সংসারের কথা তুলিবেন না। এরূপ করিলে আপনারা আর এখানে আসিবেন না।"

নাগমহাশয় কলিকাতায় আসিলে সুরেশ তাঁহাকে দীনদয়ালের কথা জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন, "সংসাররূপ কালসর্পে একবার যাহাকে দংশন করিয়াছে, তাহার আর রক্ষা নাই। মহামায়ার কৃপা না হইলে কিছুই হইবার উপায় নাই।" তাহার পর তিনি "জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ, আমার পিতাকে দয়া কর" বলিয়া আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে সুস্থ হইয়া বলিলেন, "এক্ষণেও পিতার বিষয়-চিন্তা, ছাই-ভস্ম সংসারের আলোচনা দূর হয় নাই। বৃদ্ধ হইয়াছেন, অক্ষম হইয়াছেন, নিজে কোথাও যাইতে পারেন না, কিন্তু গ্রামস্থ কোন ভদ্রলোক তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, তিনি তাঁহার সঙ্গে সংসারের নানা কথায় নিযুক্ত হন।"

দেশ হইতে আসিয়া নাগমহাশয় একদিন শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিলেন, "তাঁর উপর নির্ভর হল কই? এখনও ত নিজের চেষ্টা রহিয়াছে!" ঠাকুর নিজের শরীর দেখাইয়া বলিলেন, "এখানকার টান থাকলে সব ঠিক ঠিক হয়ে যাবে।" নাগমহাশয় বলিতেন, "তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) যাকে দিয়ে যা ইচ্ছা করিয়ে নেন, জীবের কোন কিছু সাধ্য নেই। মানুষের মনকে ঠাকুর যেমন ইচ্ছা গড়তে ভাঙতে পারতেন; এ কি মানুষের কর্ম্ম!"

নাগমহাশয়ের তীব্র বৈরাগ্য দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আবার একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "গৃহেই থেকো, যেন তেন করে মোটা ভাত মোটা কাপড় চলে যাবে।"

নাগমহাশয়—গৃহে কিরূপে থাকা যায়? পরের দুঃখ-কষ্ট দেখে কিরূপে স্থির থাকা যায়?

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওগো, আমি বলছি, মাইরি বলছি, ঘরে থাকলে তোমার কোন দোষ হবে না। তোমায় দেখে লোক অবাক হবে।

নাগমহাশয়—কি করে গৃহস্থাশ্রমে দিন কাটবে?

শ্রীরামকৃষ্ণ—তোমার আর কিছু করতে হবে না, কেবল সাধুসঙ্গ করবে।

নাগমহাশয়—সাধু চিনব কি করে? আমি যে হাঁদা লোক।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ওগো, তোমায় সাধু খুঁজে নিতে হবে না। তুমি ঘরে বসে থাকবে, যে সকল যথার্থ সাধু আছেন, তাঁরা এসে নিজেরাই তোমার সঙ্গে দেখা করবেন।

দিন যাইতে লাগিল, নাগমহাশয় ভাবিতে লাগিলেন—যতদিন সংসারধাঁধায় ঘুরিতে হইবে ততদিন শান্তির আশা দুরাশা। স্থির

করিলেন, রণজিতের উপর কুতের কার্য ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ভগবচ্চিন্তা করিবেন। সুযোগমত একদিন পালবাবুদের কাছে কথাটা পাড়িলেন। বাবুরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার তা'হলে কি করে চলবে ?" নাগমহাশয় বলিলেন, "তিনি (রণজিৎ) দয়া করিয়া যাহা দিবেন তাহাতে একপ্রকার চলিয়া যাইবে।"

পালবাবুরা দেখিলেন—নাগমহাশয়ের দ্বারা সংসারের কাজকর্ম চলা অসম্ভব, তবে যাহাতে এই প্রতিপালিত পরিবারের অন্নকষ্ট না হয় তাহার একটা উপায় করিতে হইবে। তাঁহারা রণজিৎকে ডাকাইলেন এবং লাভের অর্ধাংশ নাগমহাশয়কে দিতে স্বীকার করাইয়া কুতের কার্য বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। রণজিৎ নাগমহাশয়ের স্বভাব জানিত ; পাছে খরচ করিয়া ফেলেন এজন্য সমস্ত টাকা তাঁহাকে একেবারে দিত না, নাগমহাশয়ের বাসাখরচ চালাইয়া টাকা ডাকযোগে দীনদয়ালকে পাঠাইয়া দিত।

বন্দোবস্তের কথা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "তা বেশ হয়েছে, তা বেশ হয়েছে।"

নিশ্চেষ্ট হইয়া নাগমহাশয় উগ্রতর তপস্যায় নিমগ্ন হইলেন এবং সর্ব্বদাই শ্রীরামকৃষ্ণসকাশে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। ইতঃপূর্বে রবিবারে, ছুটির দিনে তিনি কখন দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন না ; বলিতেন, "কত বিদ্বান-বুদ্ধিমান, গণ্যমান্য লোক রবিবারে ঠাকুরের কাছে যান, আমি মূর্খ লোক, তাঁদের কথা কি বুঝব !" এজন্য অন্যান্য রামকৃষ্ণ-ভক্তগণের সঙ্গে তাঁহার দেখা-সাক্ষাৎ হয় নাই। এখন সর্বদা যাতায়াতের জন্য কাহারও কাহারও সঙ্গে পরিচয় হইতে লাগিল।

একরাত্রে গিরিশ দুইটি বন্ধুর সহিত দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। তিনি রামকৃষ্ণের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—ঘরের কোণে কৃতাঞ্জলি হইয়া অতি দীনহীনভাবে একটি লোক বসিয়া আছেন। লোকটির আকার অতি শুষ্ক, কিন্তু চক্ষু দুইটি তারার মত জ্বলিতেছে! *ঠাকুর তাহার সহিত গিরিশের আলাপ করাইয়া দিলেন। কি শুভক্ষণে দেখা! সেই প্রথম পরিচয়েই গিরিশের সহিত নাগমহাশয়ের সৌহৃদ্য জন্মিল।*

নাগমহাশয় প্রায়ই অপরাহ্নে গঙ্গাতীরে বেড়াইতেন। একদিন বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন—একটি তরুণবয়স্ক সৌম্যমূর্তি যুবক পদচারণা করিতেছেন। নাগমহাশয়ের মনে হইল, বোধ হয় ইনি একজন রামকৃষ্ণ-ভক্ত। যুবার সহিত পরিচয় করিয়া জানিলেন তাঁহার অনুমান সত্য। ইনিই স্বামী তুরীয়ানন্দ (তখন শ্রীহরিনাথ)। তুরীয়ানন্দের কঠোর ব্রহ্মচর্যের কথা বলিতে বলিতে নাগমহাশয় বলিতেন, "এমন না হলে কি আর ঠাকুরের কৃপাপাত্র হয়েছেন!"

নাগমহাশয় এখন হইতে জামাজুতার ব্যবহার একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। বার মাস একখানি ভাগলপুরী খেশ গায়ে দিয়া থাকিতেন। আহার-সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "ঈশ্বর-ইচ্ছায় যখন যেমন আহার পাবে, তাই খাবে; তোমার এতে কিছু বিধিনিষেধ নেই; তাতে কোন দোষ হবেক নি।" এজন্য আহারসম্বন্ধে নাগমহাশয় কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম রাখিতেন না। যখন যেমন পাইতেন, তেমনি খাইতেন। সাধারণতঃ তাঁহার আহার অতি অল্প ছিল, দীনান্তে গ্রাস দুই অন্ন খাইতেন; বলিতেন, "যতদিন দেহ আছে, কিছু কিছু টেক্স দিতেই হবে।"

রসনার ভালমন্দ আস্বাদের লালসাকে জয় করিবার জন্য তিনি খাদ্যদ্রব্যের সহিত লবণ বা মিষ্ট ব্যবহার করিতেন না। বলিতেন, "জিহ্বার সুখেচ্ছা হবে।"

নাগমহাশয়ের অর্ধেক বাসা ভাড়া দেওয়া ছিল। কৃত্তিবাস নামে একটি মেদিনীপুরের লোক সপরিবারে তাহাতে থাকিত এবং চালের ব্যবসায় করিত। বাসায় সেজন্য সময়ে সময়ে অনেক কুঁড়ো জমা হইত। নাগমহাশয়ের একদিন মনে হইল, সেই কুঁড়ো খাইয়া জীবনধারণ করিবেন। ভাবিলেন, "যা হোক কিছু খেয়ে জীবনধারণ করলেই হল, ভালমন্দ আস্বাদের অত প্রয়োজন কি?" লবণ বা মিষ্ট না দিয়া কেবল গঙ্গাজল মাখিয়াই সেই কুঁড়ো খাইলেন। তাহার দুই দিন এইরূপ আহারের পর কৃত্তিবাস জানিতে পারিয়া সমস্ত কুঁড়ো বেচিয়া ফেলে। সেই অবধি সে আর বাসায় কুঁড়ো জমিতে দিত না। নাগমহাশয় বলিতেন, "কুঁড়ো খেয়ে আমার কোন কষ্ট হয় নি; বরং শরীর বেশ হালকা বোধ হত, দিনরাত আহারের বিচার করতে গেলে কখনই বা ভগবানকে ডাকব, আর কখনই বা তাঁর মনন করব! নিয়ত ভালমন্দ খাদ্যের বাছবিচার করতে গেলে, শুচিবায়ু হয়।" সাধুসজ্জন-জ্ঞানে কৃত্তিবাস নাগমহাশয়কে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। বাসায় ভিখারী আসিলে নাগমহাশয় যদি ভিক্ষাদানে অসমর্থ হইতেন, কৃত্তিবাস তাঁহার সহায়তা করিত। সুরেশ বলেন, "আমার বাসা বড় রাস্তার ওপর ছিল বলিয়া নিত্য অনেক ভিখারী আসিত, কিন্তু কেহ শূন্যহস্তে ফিরিত না। একদিন এক বৃদ্ধ বৈষ্ণব নাগমহাশয়ের বাসায় ভিক্ষা করিতে আসে।

আহারোপযোগী চারটি আলোচাল ব্যতীত নাগমহাশয়ের সে দিন আর কিছুই ছিল না! কৃত্তিবাসও তখন বাসায় উপস্থিত নাই। নাগমহাশয় ভিখারীর নিকটে আসিয়া অতি বিনীতভাবে বলিলেন, 'আজ আর আমার জন্য কিছুই নেই, কেবল চারটি আলোচাল আছে। নেবেন কি?' বৃদ্ধ বৈষ্ণব তাঁহার শ্রদ্ধাদর্শনে পরম প্রীত হইয়া আলোচাল লইয়া চলিয়া গেল।"

সুরেশ বলেন, "আমার সহিত নাগমহাশয়ের ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসরের আলাপ ছিল, কিন্তু আমি কখনও তাঁহাকে জলখাবার খাইতে দেখি নাই। দেবতার প্রসাদী এবং ঠাকুরের মহোৎসবের প্রসাদী সন্দেশ ব্যতীত তিনি অন্য সন্দেশ খাইতেন না, বলিতেন, 'জিহ্বার সুখেচ্ছা হবে।' তিনি নিজে ভাল জিনিস কখনও খাইতেন না, কিন্তু অপরকে খাওয়াইতে মুক্তহস্ত ছিলেন।"

বিষয়প্রসঙ্গ নাগমহাশয় একেবারেই করিতেন না, অপরে করিলে কৌশলে বন্ধ করাইয়া দিতেন। বলিতেন, "জয় রামকৃষ্ণ। আজ কি কথা তুলিয়াছেন? ঠাকুরের নাম করুন, মায়ের নাম করুন।" কোনও কারণে কাহারও উপর ক্রোধ বা অশ্রদ্ধার উদয় হইলে তিনি নিকটে যাহা পাইতেন তাহারই দ্বারা আপনার শরীরে অতি নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিতেন। তিনি কখনও কাহারও নিন্দাবাদ করিতেন না, বা কাহারও বিপক্ষে কোন কথা বলিতেন না। একবার ব্যক্তিবিশেষের সম্বন্ধে তাঁহার মুখ দিয়া একটি বিরুদ্ধ কথা বাহির হইয়া পড়ে। নিকটে একখণ্ড প্রস্তর পড়িয়া ছিল, তিনি তদ্দ্বারা আপনার মস্তকে বারবার আঘাত করিতে লাগিলেন। মাথা ফাটিয়া অনর্গল রক্ত পড়িতে লাগিল। প্রায় মাসাবধি সেই ঘা

শুকায় নাই। বলিতেন, "বেশ হইয়াছে, যে যেমন পাজি তাহার সেইরূপ শাস্তি হওয়া দরকার।"

রিপুজয় করিবার জন্য তিনি দীর্ঘ লঙ্ঘন দিতেন, এমনকি পাঁচ-ছয় দিন পর্যন্ত নিরম্বু উপবাসে থাকিতেন। একবার এইরূপ দীর্ঘ লঙ্ঘনের পর নাগমহাশয় রন্ধন করিতে বসিয়াছেন, সেই সময় সুরেশচন্দ্র তাঁহার কাছে উপস্থিত হন। বোধ হয় সুরেশকে দেখিয়া নাগমহাশয়ের যেন কোনরূপ বিসদৃশ ভাবের উদয় হইয়া থাকিবে—"আমার অপরাধ দূর হইল না" বলিয়া তিনি রন্ধনের হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। আক্ষেপ করিতে করিতে সুরেশকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। সেদিন আর তাঁহার অন্নাহার হইল না। আধ পয়সার মুড়ি ও আধ পয়সার বাতাসা খাইয়া পড়িয়া রহিলেন।

শিরঃপীড়াবশতঃ নাগমহাশয়কে স্নান ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। এখন হইতে জীবনের শেষ বিংশতি বর্ষ তিনি আর স্নান করেন নাই। সেজন্য তাঁহার শরীর অতিশয় রুক্ষ দেখাইত। তাহার উপর কঠোর সাধনায় তাঁহার অন্তরের দীনতা অঙ্গে অঙ্গে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। গিরিশ বলেন, 'অহং' শালাকে ঠেঙ্গিয়ে ঠেঙ্গিয়ে নাগ-মহাশয় তার মাথা ভেঙ্গে ফেলে দিয়েছিলেন, তার আর মাথা তোলবার জো ছিল না।" পথ চলিবার সময় তিনি কখনও কাহারও অগ্রে যাইতে পারিতেন না। অতি সামান্য মুটে মজুরদিগকেও পথ ছাড়িয়া দিয়া পশ্চাতে চলিতেন। তিনি কাহারও ছায়া মাড়াইতে পাড়িতেন না এবং বিছানায়ও বসিতে পারিতেন না। কেহ তামাক সাজিয়া দিলে তাঁহার খাওয়া হইত না, কিন্তু তিনি সকলকে তামাক সাজিয়া খাওয়াইতেন। মনের মত লোক পাইলে

ছিলিমের পর ছিলিম সাজিয়া খাওয়াইতেন এবং আপনিও খাইতেন। এমনকি যখন সে লোক বিদায় চাহিত, নাগমহাশয় ছাড়িতেন না, "আর এক ছিলিম খাইয়া যান" বলিয়া তাঁহাকে বসাইতেন, তাহার পর কত এক ছিলিম চলিত! তিনি বলিতেন, "আমি অধম, কীটাধম; আমার দ্বারা কোন কার্য হইবার নহে, তবে যদি আপনাদের তামাক সাজিয়া কৃপালাভ করিতে পারি, তবে এই জন্ম সফল হইবে।"

নাগমহাশয় রাগমার্গের সাধক হইলেও বৈধীভক্তির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আপনি যেরূপ উগ্র সাধন করিতেন, অপরকেও তদ্রূপ করিতে উপদেশ দিতেন, এই লইয়া সুরেশের সঙ্গে একদিন তর্ক-বিতর্ক হইয়াছিল। নাগমহাশয়ের সঙ্গে আট-নয় দিন দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াতের পর সুরেশকে কার্য উপলক্ষে কোয়েটা যাইতে হয়। যাইবার পূর্বে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে দীক্ষা ও সাধন-উপদেশ লইবার জন্য নাগমহাশয় সুরেশকে নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিয়া বলেন। মন্ত্রে তখন সুরেশের বিশ্বাস ছিল না বলিয়া তিনি নাগমহাশয়ের সহিত বিস্তর বাদপ্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির হইল, শ্রীরামকৃষ্ণ যেরূপ উপদেশ দিবেন, সেইরূপ কার্য হইবে। পরদিন দুই জনেই দক্ষিণেশ্বরে গেলেন এবং উপস্থিত হইয়াই নাগমহাশয় সুরেশের দীক্ষার কথা উত্থাপন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "ওগো, এ ত ঠিক কথা বলছে! দীক্ষা নিয়ে সাধন-ভজন করতে হয়, তুমি এর কথা মানছ না কেন?" সুরেশ বলিলেন, "মন্ত্রে আমার বিশ্বাস নাই।" শ্রীরামকৃষ্ণ নাগমহাশয়কে বলিলেন, "তা এখন ওর দরকার নাই; হবে হবে, পরে হবে।"

কিছুদিন কোয়েটায় বাস করিবার পর সুরেশের মন দীক্ষার জন্য লালায়িত হইয়া উঠিল; স্থির করিলেন কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুরের নিকট দীক্ষা লইবেন। কিন্তু যখন তিনি কলিকাতায় আসিলেন তখন শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসান প্রায়। দিন থাকিতে নাগমহাশয়ের কথা শুনেন নাই ভাবিয়া সুরেশের মনে বড ধিক্কার হইল। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন স্ব-স্বরূপ সংবরণ করিলেন, সুরেশের তখন বিষম আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। রাত্রে নিত্য গিয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া থাকিতেন আর মনের দুঃখ পতিতপাবনী জাহ্নবীকে বলিতেন। একদিন ধরনা দিয়া গঙ্গাকূলে পড়িয়া রহিলেন। রাত্রিশেষে দেখিলেন—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ গঙ্গাগর্ভ হইতে উঠিয়া আসিতেছেন। সুরেশের আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। ঠাকুর কাছে আসিয়া তাঁহার কানে বীজমন্ত্র দিলেন। সুরেশ যেমন তাঁহার পদধূলি লইতে যাইবেন, অমনি শ্রীমূর্তি অন্তর্হিত হইল!

এইরূপে প্রায় চারি বৎসর কাটিয়া গেল। ক্রমে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের সময় সন্নিকট হইয়া আসিয়াছে। দক্ষিণে-শ্বরের সে আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। কলিকাতার উত্তরে কাশীপুরে রাণী কাত্যায়নীর জামাতা গোপালবাবুর বাগানবাটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ রুগ্নশয্যায় পড়িয়া আছেন। নাগমহাশয় বুঝিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের স্ব-স্বরূপ-সংবরণের আর বেশী বিলম্ব নাই। এখন আর সর্বদা ঠাকুরের কাছে যাইতে পারিতেন না; বলিতেন, "ঠাকুরের রোগযন্ত্রণা দেখা দূরের কথা, স্মরণ করিতেও হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হইয়া যাইত। যখন ঠাকুর স্বেচ্ছায় নিজ শরীরে রোগ রাখিয়া দিলেন, যখন কোনরূপেই তাঁহার যন্ত্রণার লাঘব করিতে

পারিলাম না, তখন তাঁহার সমীপে না যাওয়াই স্থির করিয়া ঘরে বসিয়া রহিলাম। কেবল কদাচ কখন যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিয়া আসিতাম।" শ্রীরামকৃষ্ণের দেহে যখন অহরহঃ অন্তর্দাহ হইতেছে সেই সময় একদিন নাগমহাশয়কে দেখিয়া তিনি "ওগো, এগিয়ে এস, এগিয়ে এস, আমার গা ঘেঁসে বস ; তোমার ঠাণ্ডা শরীর স্পর্শ করে আমার শরীর শীতল হবে।"—বলিয়া অনেকক্ষণ নাগমহাশয়কে আলিঙ্গন করিয়া বসিয়া রহিলেন।

সুরেশ কোয়েটা হইতে আসিয়া ঠাকুরকে দেখিতে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "সেই ডাক্তার কোথা? সে নাকি খুব ডাক্তারি জানে? তাকে একবার আসতে বলো ত!" সুরেশ আসিয়া নাগমহাশয়কে জানাইলেন। নাগমহাশয় কাশীপুরে উপস্থিত হইলে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "ওগো এসেছ? তা বেশ হয়েছে! এই দেখ না, ডাক্তার-কবিরাজেরা ত সব হার মেনে গেছে! তুমি কিছু ঝাড়ফুঁক জান? জান ত দেখ দিকি যদি কিছু উপকার করতে পার!" নাগমহাশয় নতমুখে একটু চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাংঘাতিক ব্যাধি মানসিক শক্তিবলে নিজদেহে আকর্ষণ করিয়া লইবেন। সহসা তাঁহার শরীরে এক অপূর্ব উত্তেজনা দেখা দিল, বলিলেন, "হাঁ, হাঁ, জানি, আপনার কৃপায় সব জানি, এখনি রোগ সারিয়ে দেব।" এই বলিয়া ঠাকুরের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিয়া তাঁহাকে আপনার নিকট হইতে দূরে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন, "তা তুমি পার, রোগ সারাতে পার!"

ঠাকুরের অপ্রকট হইবার পাঁচ-সাত দিন পূর্বে নাগমহাশয় আর

একদিন তাঁহাকে দেখিতে যান। ঘরে প্রবেশ করিয়াই শুনিলেন ঠাকুর বলিতেছেন, "এ সময় কি কোথাও আমলকী পাওয়া যায়? মুখটা যেন বিস্বাদ হয়েছে, আমলকী চিবুলে বোধ হয় পরিষ্কার হত।" উপস্থিত ভক্তগণের মধ্যে একজন বলিলেন, "মহাশয়! এখন ত আমলকীর সময় নয়, কোথায় পাওয়া যাবে?" নাগমহাশয় ভাবিতে লাগিলেন—ঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে যখন আমলকীর কথা বাহির হইয়াছে তখন নিশ্চয় কোথাও না কোথাও পাওয়া যাবে। তিনি জানিতেন, ঠাকুরের যখন যাহা অভিলাষ হইত, যে কোন প্রকারে হউক তাহা আসিত। একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের কমলালেবু খাইবার ইচ্ছা হয়। ঠাকুর লেবুর কথা স্বামী অদ্ভুতানন্দকে (তখন লাটু) বলিতেছিলেন। কিছুক্ষণ পরে নাগমহাশয় কমলা-লেবু লইয়া দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। ঠাকুর অতি সাগ্রহে সেই লেবু খাইয়াছিলেন। এই ঘটনাটি ভাবিতে ভাবিতে নাগমহাশয় কাহাকেও কিছু না বলিয়া আমলকী অন্বেষণ করিতে বাহির হইয়া গেলেন। ক্রমে দুই দিন, আড়াই দিন অতিবাহিত হইয়া গেল, নাগমহাশয়ের দেখা নাই। এই সময় তিনি কেবল বাগানে বাগানে আমলকী অন্বেষণ করিয়া বেড়াইয়াছেন। তিন দিনের দিন আমলকী লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। আমলকী পাইয়া ঠাকুর বালকের ন্যায় আনন্দ করিতে করিতে বলিলেন, "আহা, এমন সুন্দর আমলকী তুমি এই অসময়ে কোথা হতে যোগাড় করলে?" তারপর ঠাকুর স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে (তখন শশী) নাগমহাশয়ের জন্য আহার প্রস্তুত করিতে বলিলেন। নাগমহাশয় ঠাকুরের নিকটে বসিয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন।

আহার প্রস্তুত হইলে রামকৃষ্ণানন্দ সংবাদ দিলেন, কিন্তু নাগমহাশয় উঠিলেন না। অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে আহার করিবার জন্য নীচে যাইতে আদেশ করিলেন। নাগমহাশয় নীচে আসিয়া আসনে বসিলেন। কিন্তু ভক্ষ্যদ্রব্য স্পর্শ করিলেন না। আহার করিবার জন্য সকলে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু নাগমহাশয় স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। সে দিন একাদশীর উপবাস; নাগমহাশয়ের মনোভাব—ঠাকুর যদি দয়া করিয়া প্রসাদ দেন তবেই ব্রতভঙ্গ করিবেন, নচেৎ নয়। কিন্তু সে কথা কাহাকেও বলেন নাই। নাগমহাশয় যখন কিছুতেই আহার করিলেন না, তখন রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরকে গিয়া সে কথা জানাইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "ওর খাবার পাতাটা এখানে নিয়ে আয়।" তাহাই হইল। রামকৃষ্ণানন্দ পাতাশুদ্ধ খাদ্যদ্রব্য আনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে ধরিলে তিনি সকল সামগ্রীর অগ্রভাগ জিহ্বায় স্পর্শ করিয়া দিয়া বলিলেন, "এইবার দিগে, খাবে এখন।" রামকৃষ্ণানন্দ সেই পাতা পুনরায় নাগমহাশয়কে আনিয়া দিলে নাগমহাশয় 'প্রসাদ—প্রসাদ—মহাপ্রসাদ' বলিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন এবং পরে খাইতে আরম্ভ করিলেন। খাইতে খাইতে পাতাখানি পর্যন্ত তাঁহার উদরস্থ হইয়া গেল। প্রসাদ বলিয়া দিলে নাগমহাশয় কিছুই পরিত্যাগ করিতেন না। রামকৃষ্ণানন্দ বলেন, "আহা সে দিন নাগমহাশয়ের কি ভাবই দেখা গিয়াছিল!" এই ঘটনার পর শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণ নাগহাশয়কে আর প্রায় পাতায় করিয়া প্রসাদ দিতেন না। যদি কখনও পাতায় প্রসাদ দেওয়া হইত, সকলে সতর্ক থাকিতেন, নাগমহাশয়ের খাওয়া

শেষ হইলেই পাতাখানি কাড়িয়া লইতেন। যে ফলে বিচি আছে, তাহার বিচি অন্তরিত করিয়া তাঁহাকে খাইতে দেওয়া হইত। ১২৯৩ সালে, ৩১ শে শ্রাবণ, রবিবার, সংক্রান্তি-দিনে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসংবরণ করিলেন। সংবাদ পাইয়া নাগমহাশয় শ্মশানে গমন করেন। পরে গৃহে আসিয়া নিরম্বু উপবাস করিয়া রহিলেন।

ঠাকুরের অপ্রকট হইবার পর স্বামী বিবেকানন্দ সকল ভক্তেরই আশ্রয়-স্বরূপ হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। স্বামীজি শুনিলেন—নাগমহাশয় একখানি লেপ মুড়ি দিয়া অনাহারে পড়িয়া আছেন। এমনকি স্নান শৌচাদির জন্যও উঠেন না। স্বামী অখণ্ডানন্দ (তখন গঙ্গাধর) ও স্বামী তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে লইয়া নরেন্দ্রনাথ নাগমহাশয়ের বাসায় গেলেন। অনেক ডাকাডাকির পর নাগমহাশয় উঠিয়া বসিলেন। নরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আজ আমরা আপনার এখানে ভিক্ষার জন্য এসেছি।" নাগমহাশয় তৎক্ষণাৎ বাজারে গিয়া নানাবিধ দ্রব্যাদি কিনিয়া আনিলেন। ইতোমধ্যে অতিথিত্রয় স্নান করিয়া আসিয়াছেন এবং নাগমহাশয়ের ভাঙ্গা তক্তাপোশের উপর বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ করিতেছেন। তিনখানি পাতা করিয়া আহার্য দেওয়া হইল। স্বামীজি আর একখানি পাতা করাইয়া তাহাতেও খাবার দেওয়াইলেন। পরে সেই পাতায় বসিবার জন্য নাগমহাশয়কে বিস্তর অনুরোধ করিলেন, তিনি কিছুতেই বসিলেন না। স্বামীজি বলিলেন, "আচ্ছা থাক্, উনি পরেই খাবেন।" আহারান্তে বিশ্রাম করিতে বসিয়া নরেন্দ্রনাথ নাগমহাশয়কে আবার অনুরোধ করিলেন। নাগমহাশয় বলিলেন,

"হায়, হায়! আজও এ দেহে ভগবানের কৃপা হল না। একে আবার আহার দেব, আমা হতে তা আর হবে না।" স্বামীজি বলিলেন, "আপনাকে খেতেই হবে, নইলে আমরা যাচ্ছি না।" অনেক বুঝাইবার পর নাগমহাশয় সেদিন আহার করেন। শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাবসানের পর বাগবাজারনিবাসী প্রসিদ্ধ ভক্ত শ্রীযুক্ত বলরাম বসু পুরীধামে বাস করিবার জন্য নাগমহাশয়কে বিশেষ জেদ করেন। নবদ্বীপে বাস করিবার জন্য পালবাবুরা তাঁহাকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিতে উভয়েই স্বীকৃত হন। নাগমহাশয় বলিলেন, "ঠাকুর গৃহে থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার বাক্য এক চুল লঙ্ঘন করিতে আমার তিলমাত্র সাধ্য নাই। সকলের অনুরোধ লঙ্ঘন করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ মাথায় ধরিয়া নাগমহাশয় দেশে গিয়া গৃহে বাস করিলেন।

এই সময় ভাগ্যকুলের কুণ্ডুবাবুরা নাগমহাশয়কে ৫০৲ টাকা মাসিক বেতনে পারিবারিক চিকিৎসকরূপে থাকিবার অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি স্বীকৃত হন নাই।

দেশে অবস্থান

গৃহে বাস করিয়া নাগমহাশয় প্রাণপণ যত্নে পিতৃসেবা করিতে লাগিলেন। দীনদয়াল এখন অক্ষম হইয়াছেন। নাগমহাশয় অনেক সময়ে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া স্নান শৌচাদি করাইয়া আনিতেন। পরিপাটিরূপে তাঁহার শয্যারচনা করিয়া দিতেন। তাঁহার যেদিন যাহা খাইতে ইচ্ছা হইত, যত্নে সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। দীনদয়াল কোন সময় আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "দুর্গাচরণ ত উপার্জন করিল না; কত লোকে মায়ের অর্চনা করিতেছে, আমাদের শক্তি থাকিলে আমরাও করিতাম, সে সৌভাগ্য হইল না।" নাগমহাশয় সে কথা জানিতে পারিয়া, সেই বৎসর হইতে পিতার সন্তোষার্থে প্রতি বৎসর দুর্গাপূজা, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, সরস্বতীপূজা প্রভৃতির আয়োজন করিতেন। দীনদয়ালকে তিনি ক্ষণিকের জন্য সংসারচিন্তা করিবার অবসর দিতেন না, সর্ব্বদা তাঁহার কাছে বসিয়া ভাগবত পুরাণাদি শাস্ত্র পাঠ করিতেন। পুত্রের নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় পিতার মন ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া গেল। নাগমহাশয় প্রতিবৎসর শারদীয় উৎসবের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনিতে পূজার পূর্বে একবার কলিকাতায় আসিতেন। এবার আসিয়া সুরেশকে বলিলেন, "ক্রমে তাঁহার (দীনদয়ালের) মন পরিবর্ত্তিত হইতেছে। বিষয়চিন্তা এখন আর তাঁহাকে আক্রমণ করে না। তিনি দিনরাত কেবল ভগবচ্চিন্তায় ও ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে অতিবাহিত করেন।

পূর্ববঙ্গ তন্ত্র-প্রধান দেশ, শুদ্ধাভক্তি অপেক্ষা সেথায় সিদ্ধাইএর আদর বেশী। স্বামী বিবেকানন্দ একদিন আমায় বলিয়াছিলেন, "ওরে, তোদের বাঙ্গাল দেশে কেবল বৈষ্ণব ও তান্ত্রিকেরই প্রভুত্ব দেখে এলুম! এমন বামাচারী ও সিদ্ধাইএর দেশ ত বড় একটা চোখে পড়ে নি!" শ্রীরামকৃষ্ণ একবার নাগমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "ওগো, তোমাদের ওদেশে কেমন সব সাধু আছেন?" নাগমহাশয় বলিলেন, "ওদেশে কোন বিশিষ্ট সাধু ভক্তের দর্শন পাই নাই।" তিনি বলিতেন, "গঙ্গাহীন দেশে ভক্তেরা শরীর-ধারণ করিতে চাহে না। তার্কিক হইতে পারেন, পণ্ডিত হইতে পারেন, কিন্তু মা ভাগীরথী-তীরে জন্মগ্রহণ না করিলে শুদ্ধাভক্তি লাভ হয় না।" নাগমহাশয় দেশে আসিয়া বাস করিবার কিছু পূর্ব হইতে শ্রীযুক্ত নটবর গোস্বামী ও শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী পূর্বাঞ্চলে শুদ্ধাভক্তি-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতেছিলেন।

নাগমহাশয় জানিতেন বিজয় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত। দেশে আসিয়া নাগমহাশয়কে একবার ঢাকায় যাইতে হয়, সেই সুযোগে তিনি বিজয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। বিজয় নাগমহাশয়কে চিনিতেন না; কিন্তু সাধন-প্রসূত সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিবলে বুঝিয়াছিলেন যে, দীনহীন বাতুলের বেশে কোন মহাপুরুষ তাঁহাকে দর্শন দিতে আসিয়াছেন। যখন কথায় কথায় প্রকাশ হইল নাগমহাশয় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত, বিজয়ের তখন আর আনন্দের সীমা রহিল না। পরমাত্মীয়জ্ঞানে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং অশেষবিধ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিজয়কে দেখিয়া নাগমহাশয়ও আহ্লাদিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বলিতেন,

"ঠাকুরকে দর্শন করিয়াও কেন যে তিনি (বিজয়) অন্যান্য সাধুর কাছে গিয়া ঢলিয়া পড়িতেন, ইহাই এক আশ্চর্য বিষয় !" বিজয় বিখ্যাত বারদীর ব্রহ্মচারীর নিকট যাতায়াত করিতেন। তারপর নাগমহাশয় আরও বলিতেন, "গোস্বামী মহাশয়ের ন্যায় মহাজনেরও যখন মতিভ্রম হয়, তখন অন্যে পরে কা কথা।" বিজয় শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে বসিয়া চক্ষু মুদিয়া ধ্যান করিতেন। শুনিয়া গিরিশ বাবু বলিয়াছিলেন, "যাঁকে পলকহীন নেত্রে দর্শন করা উচিত, তাঁর সামনে চোখ বুজে বসে থাকে, এ আবার কেমন লোক !" এই কথার উল্লেখ করিয়া নাগমহাশয় গিরিশবাবুর বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ প্রশংসা করিতেন এবং 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া গিরিশের উদ্দেশে প্রণাম করিতেন।

পূর্ববঙ্গে বারদীর ব্রহ্মচারীর বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি ছিল। ব্রহ্মচারীর শিষ্য ব্রহ্মানন্দ ভারতীর জেদে নাগমহাশয় একবার বারদী গিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দের পূর্বনাম—তারাকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়। তারাকান্ত ওকালতী করিয়া মাসে প্রায় দুই শত, আড়াই শত টাকা উপার্জন করিতেন। সঙ্কীর্তন, সাধুসেবা ও সাধনভজনে তারাকান্তের বিশেষ উৎসাহ ছিল। ব্যবসায় ছাড়িয়া ক্রমে তিনি সাধনভজনে মন দিলেন। তারাকান্ত সর্বদাই নাগমহাশয়ের কাছে আসিতেন এবং কখন কখন একাদিক্রমে দশ-পনের দিন পর্যন্ত দেওভোগে থাকিতেন। কিছুদিন পরে তিনি উক্ত ব্রহ্মচারীর নিকট যাতায়াত করিতে আরম্ভ করিলেন। তারাকান্ত কখন কখন ব্রহ্মচারীর শিষ্য এবং কখন বা আপনাকে ব্রহ্মচারীর পূর্বজন্মের গুরু বলিয়া পরিচয় দিতেন। তারাকান্ত একদিন দেওভোগে

আসিয়া নাগমহাশয়কে বলেন যে, তাঁহার পূর্বজন্ম স্মরণ হইয়াছে এবং তিনি এখন চন্দ্র, সূর্য, ব্রহ্মলোক প্রভৃতিতে গমনাগমন করিতে পারেন। আরও বলেন, ধর্মাধর্ম সব মিথ্যা, এক জ্ঞানই সত্য। তারাকান্তের ভাবান্তর দেখিয়া নাগমহাশয় বলিতেন, "যথার্থ গুরু ও উপদেষ্টার আশ্রয় না পাইলে উচ্চ উচ্চ সাধকগণও বিপথগামী হইয়া পড়েন।" ব্রহ্মচারীকে দেখিবার জন্য তারাকান্ত মধ্যে মধ্যে নাগমহাশয়কে অনুরোধ করিতেন। একবার তাঁহার নিতান্ত পীড়াপীড়িতে নাগমহাশয় স্বীকৃত হইলেন। সাধুদর্শনে যাইতেছেন, নারায়ণগঞ্জ হইতে কিছু ফল মিষ্টান্ন কিনিয়া লইয়া গেলেন। ব্রহ্মচারীর সমীপে উপস্থিত হইয়া তিনি সেইগুলি উপহার দিলেন, কিন্তু ব্রহ্মচারী তাহার কণামাত্র স্পর্শ করিলেন না। নিকটে একটা ষাঁড় দাঁড়াইয়াছিল, সমস্ত দ্রব্য তাহাকে খাইতে দিলেন। তাহার পর নাগমহাশয়ের শুষ্ক কায়, রুক্ষ কেশ, দীনহীন বেশ দেখিয়া ব্রহ্মচারী তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় নতশিরে বসিয়া রহিলেন। তাঁহাকে নিরুত্তর দেখিয়া ব্রহ্মচারী অধিকতর উত্তেজিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের বিরুদ্ধে বহুবিধ অযথা বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় আর সহ্য করিতে পারিলেন না। ক্রোধে তাঁহার শরীর দিয়া অগ্নি বাহির হইতে লাগিল। সহসা দেখিলেন, তাঁহার সন্নিকটে এক ভীষণাকৃতি কৃষ্ণপিঙ্গল ভৈরবমূর্তি প্রকাশিত হইয়া ব্রহ্মচারীকে ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবার জন্য অনুমতি চাহিতেছে! নাগমহাশয় ক্রোধ সংবরণ করিয়া লইলেন। "হায় ঠাকুর! তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কেন আমি সাধুদর্শন করিতে আসিলাম? কেন আমার

এত মতিভ্রম হইল !” বলিয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন ; তাহার পর, ‘হা রামকৃষ্ণ, হা রামকৃষ্ণ’ বলিতে বলিতে ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। যখন ব্রহ্মচারী দৃষ্টিবহির্ভূত হইলেন, তখন শান্ত হইয়া চলিতে লাগিলেন। গৃহে ফিরিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন আর কখন সাধুদর্শনে যাইবেন না। কেহ সাধুদর্শনের কথা বলিলে তিনি বলিতেন, “আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও না কো কারু ঘরে।”

নাগমহাশয় সাংসারিক কোন ঘটনায় কখন বিচলিত হইতেন না, কিন্তু গুরুনিন্দা শুনিলে এই ‘অক্রোধ পরমানন্দ’ সাধকের ধৈর্যচ্যুতি হইত। নারায়ণগঞ্জের কোন বিশিষ্ট ভদ্রলোক একদিন নাগমহাশয়ের শ্বশুরবাটীতে বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় কতকগুলি অযথা দোষারোপ করেন। নাগমহাশয় অতি বিনীতভাবে তাঁহাকে নিরস্ত হইতে বলিলেন ; কিন্তু তিনি যতই বিনয় করিতে লাগিলেন, লোকটির বাক্য ততই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিতে লাগিল। নাগমহাশয় তবু বলিলেন, “এ বাড়ীতে বসিয়া অযথা ঠাকুরের নিন্দাবাদ করিবেন না।” তখনও সে ব্যক্তি নিরস্ত হইলেন না। অবশেষে নাগমহাশয় বলিলেন, “তুমি এখান থেকে এখন বেরোও, নতুবা আজ মহা অকল্যাণ হবে।” লোকটির তাহাতেও চৈতন্য নাই ; রসনার স্বর পর্দায় পর্দায় উঠিতেছে, আরও এক গ্রাম উঠিল। নাগমহাশয়ের চক্ষু দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল, ক্রোধে জ্ঞানশূন্য হইয়া লোকটির পৃষ্ঠে পাদুকাঘাত করিতে করিতে বলিলেন, “বেরোও শালা এখান থেকে, এখানে বসে ঠাকুরের নিন্দা !” লোকটি দেওভোগ গ্রামের একজন প্রতিপত্তিশালী, প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি। প্রহার খাইয়া যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,

"আচ্ছা, দেখা যাবে তুমি কেমন সাধু! এর প্রতিশোধ শীঘ্রই পাবে।" নাগমহাশয় তাঁহার কথায় ভ্রূক্ষেপ না করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'হা ঠাকুর! তুমি এমন লোককে কেন এখানে নিয়ে এসেছ, যে তোমার নিন্দা করে? ধিক্ এ সংসার-আশ্রমকে!" নাগমহাশয় কিছুক্ষণ পরে শান্ত হইয়া বসিলেন। সে লোকটি কয়েকদিন পরে ফিরিয়া আসিলেন এবং নাগমহাশয়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। নাগমহাশয় অমনি জল! তাঁহাকে অভয় দিয়া কাছে বসাইয়া, তামাক সাজিয়া খাওয়াইলেন। তিনি বাটী যাইবার সময় সঙ্গে সঙ্গে আলো লইয়া কতকদূর তাঁহাকে রাখিয়া আসিলেন। সাধুর পাদুকাঘাতে লোকটির চৈতন্য হইয়াছিল। গিরিশবাবু এই ঘটনা শুনিয়া নাগমহাশয় কলিকাতায় আসিলে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি ত জুতো পরেন না, তবে তাকে মারতে জুতো পেলেন কোথা?" নাগমহাশয় বলিলেন, "কেন, তার জুতা দিয়েই তাকে মারলাম।" তারপর 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। গিরিশ বলেন, "নাগমহাশয় যথার্থ ই ফণাধারী নাগ।"

একদিন আমি তাঁহার সঙ্গে বেলুড় মঠে যাইতেছিলাম। চলতি নৌকা, নানা প্রকৃতির লোক যাত্রী, নাগমহাশয় উঠিয়া জড়সড় হইয়া বসিলেন। নৌকা লালাবাবুর ঘাটের কাছে আসিতেই মঠ দেখা গেল। নাগমহাশয় আমাকে তাহা দেখাইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে তদ্রূপ করিতে দেখিয়া নৌকার একজন আরোহী মঠের নানারূপ নিন্দা করিতে লাগিল। পরম আমোদ বোধ করিয়া আরও দুই-তিন জন উৎসাহে তাহার সঙ্গে যোগ

দিল। নাগমহাশয় আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠদ্বয় প্রথম নিন্দুকের মুখের সম্মুখে আনিয়া বলিতে লাগিলেন—"তোমরা ত জান কেবল 'যোগাযোগ' আর রূপার চাক্তি! তোমরা মঠের কি জান? চোখে ঠুলি দিয়ে বসে আছ। ধিক্ ঐ জিহ্বাকে, যাতে অনর্থক সাধুনিন্দা করলে।" নিন্দুক নাগমহাশয়ের উদ্ধত মূর্তি দেখিয়া মাঝিকে ডাকিয়া বলিল, "ওরে ভিড়ো, ভিড়ো, নৌকা ভিড়ো, আমি এইখানেই নেমে যাবো!" পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ আমার নিকট সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "স্থানবিশেষে নাগমহাশয়ের মত সিংহ হওয়াই দরকার।" পরে বলিলেন, "এ কি নকল রে, এ যে আসল সোনা।"

বারদীর ব্রহ্মচারীর এক শিষ্য ছিলেন, তিনি কখন কখন নাগমহাশয়ের নিকট আসিতেন। এই ঘটনার পর শিষ্য আসিয়া একদিন তাঁহাকে বলিলেন, "ব্রহ্মচারী শাপ দিয়াছেন, মুখে রক্ত উঠিয়া এক বৎসরের মধ্যে আপনার মৃত্যু হইবে।" নাগমহাশয় হাসিয়া বলিলেন, "তা আমার একটি রোমও নষ্ট হইবে না।" বৎসর পার হইয়া গেল, "শাপ বিফল হইল দেখিয়া শিষ্য বারদীর সংস্রব পরিত্যাগ করিয়া নাগমহাশয়ের অনুগত হইলেন এবং জ্ঞানপথ ছাড়িয়া ভক্তিপথে ত্বরায় উন্নত হইলেন। নাগমহাশয় বলিতেন, "বারদীর ব্রহ্মচারী গৃহস্থ লোকদের বেদান্তজ্ঞানের কথা বলিয়া অনেকের মস্তিষ্ক বিকৃত করিয়া দিয়াছেন। গৃহীদের পক্ষে জ্ঞানবিচারপথ যেমন বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপবাক্য!"

নাগমহাশয়ের বাড়ীতে একদিন এক সন্ন্যাসী আসিয়াছিলেন, তাঁহার ত্যাগনিষ্ঠার পরিচয় ছিল কেবল বস্ত্রে; বিরক্ত ভাব নিরীহ

গৃহস্থদের উপর; এবং ঈশ্বরানুরাগ যত থাক বা না থাক, গঞ্জিকার উপর অতি অসাধারণ আসক্তি ছিল। গঞ্জিকাসেবায় তেমন দক্ষ মহেশ্বর আর দ্বিতীয় ছিল না! সন্ন্যাসী উলঙ্গ হইয়া আসিতেছিলেন, কিন্তু দূর হইতে নাগমহাশয়কে দেখিয়া একটু কিন্তু হইয়া কাপড়খানি পরিলেন; তারপর নাগমহাশয়ের কাছে গিয়া সিদ্ধাইএর প্রসঙ্গ আরম্ভ করিলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, "এ সকল ভাব অতি হেয় এবং শুদ্ধাভক্তিলাভের বিরোধী।" সন্ন্যাসী সে কথা কানে না তুলিয়া বলিলেন, "আমি বিষ্ঠা খেয়ে সাত দিন থাকতে পারি!"

নাগমহাশয়— তাতে আর বাহাদুরি কি! কুকুর সারাজীবন বিষ্ঠা খেয়ে জীবনধারণ করতে পারে।

সন্ন্যাসী— আমি উলঙ্গ হইয়া সারাজীবন অবস্থান করিতেছি।

নাগমহাশয়— উন্মাদ, পাগল, পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর জন্তুরাও উলঙ্গ থাকে। তাহাতে আর তাহাদের বাহাদুরি কি?

সন্ন্যাসী— আমি বৃক্ষমূলে জীবনযাপন করিতেছি!

নাগমহাশয়— কত ইতর জন্তু গাছ আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহাতে আর বিশেষ প্রশংসার বিষয় কি?

সন্ন্যাসী এইরূপ আরও আরও কত সিদ্ধাইএর কথা বলিতেন, নাগমহাশয়ের প্রিয়ভক্ত নটবর আর অবসর দিলেন না, সন্ন্যাসীকে সংহারমুদ্রা দেখাইলেন। সিদ্ধাই-সম্বন্ধে নাগমহাশয় বলিতেন, "ও ত পাঁচ মিনিটের কার্য, পাঁচ মিনিট বসলেই যেকোন সিদ্ধি লাভ করা যায়।"

সাধারণতঃ এইরূপ সাধু-সন্ন্যাসীই তখন পূর্ববঙ্গে দেখা যাইত

এবং তথায় তাহাদের প্রতিষ্ঠাও ছিল। নাগমহাশয়ের দীনহীন ভাব, মলিন বেশ; বিশেষতঃ তাঁহাকে সচরাচর লোকের ন্যায় সংসারের কাজকর্মও করিতে দেখিয়া প্রথম প্রথম কেহ তাঁহাকে সাধু মহাপুরুষ বলিয়া বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু একবার তাঁহার সহিত যিনি আলাপ করিতেন, তিনিই বুঝিতেন—এই দীন হীন গৃহস্থ মনুষ্যদেহে দেবতা! আমার আত্মীয় দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় আমার সঙ্গে একদিন দেওভোগে গিয়াছিলেন। দীনবন্ধু সুগায়ক, নাগমহাশয় তাঁহার 'প্রসাদপদাবলী' শুনিয়া যার পর নাই তৃপ্তিলাভ করেন। দীনবন্ধু বলেন, "এমন মহাপুরুষ জীবনে আর দর্শন করি নাই। শাস্ত্রে বিদুরাদি মহাত্মার কথা শোনা যায়; নাগমহাশয়কে দেখিয়া মনে হয়, তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা কিছুতেই কম নহেন। আমার মনে হয় বিদুর নাগমহাশয়ের দেহে পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।"

আমার শ্বশুর শ্রীযুক্ত মদনমোহন বারুড়ী মহাশয় লোক-পরম্পরায় শুনিতে পান যে, নাগমহাশয়ের সংশ্রবে আসিয়া তাঁহার জামাতা (লেখক) লেখাপড়ায় এবং সাধারণতঃ সংসারধর্মে আস্থাহীন হইতেছেন। প্রকৃত অবস্থা কি জানিবার জন্য মদনবাবু একদিন দেওভোগে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নাগমহাশয়কে দেখিয়া তাঁহার সকল উদ্বেগ দূর হইল। নাগমহাশয়ের আদরযত্নে, সরল অমায়িক ব্যবহারে ও অতিথিসৎকারে পরম প্রীত হইয়া মদনবাবু বলিয়াছিলেন, "জামাতা যখন এমন মহাপুরুষের কাছে যাতায়াত করেন, তখন তাঁহার ভয় বা চিন্তার কারণ কিছুই নাই।"

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, "ফুল ফুটিলে আর ভ্রমরকে ডাকিতে হয়

না।" যাঁহারা যথার্থ সাধুসঙ্গপ্রিয়, প্রকৃত ধর্মানুরাগী তাঁহারা ক্রমে একে একে নাগমহাশয়কে দেখিতে আসিতে লাগিলেন। ক্রমে দূর দূরান্তর হইতে লোক আসিতে লাগিল। সময় সময় মুন্‌সেফ, ডেপুটী প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্মচারিগণও আসিতেন। নাগমহাশয় মাতাঠাকুরাণীকে বলিলেন, "ঠাকুরের শেষ দয়া ও আশীর্বাদ ইদানীং পূর্ণ হইল। যাঁহারা এখানে আসিতেছেন, তাঁহারা সকলেই যথার্থ ধর্মানুরাগী, ঠাকুর আমায় সেইরূপ বলিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের যত্ন আদর করিও, তোমার মঙ্গল হইবে।"

রাজকর্মচারিগণ আসিলে নাগমহাশয় তাঁহাদিগকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিতেন, বলিতেন, "মহাশক্তির ইচ্ছায় ইংরেজ দেশের রাজা হইয়াছেন, ইঁহাদিগকে অমান্য করিলে ভগবতী অসন্তুষ্ট হন।" তিনি ইংরেজরাজত্বের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। বলিতেন, "মা মহারাণী শক্তির অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার পুণ্যেই ইংরেজের অভ্যুদয় হইয়াছে। ইঁহাদের শাসনে প্রজা সুখে থাকিবে।" যুদ্ধবিগ্রহের কথায় বলিতেন, "জগতে রজোগুণের প্রভাবে চিরদিন মারামারি কাটাকাটি চলিয়াছে। সত্ত্ববৃত্তিতে স্থিত না হইলে হিংসাবৃত্তির নিরোধ হয় না।"

নাগমহাশয়কে যেকেহ দেখিতে আসিত, তিনি তাহাকে কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িতেন না। যাহারা দুই-তিন দিনের পথ হইতে আসিত, তাহাদিগকে আবার শয়নের স্থান দিতে হইত। যাহার যত দিন ইচ্ছা থাকিত। পূজামণ্ডপের সম্মুখে দক্ষিণদিকের ঘরখানি অতিথিদিগের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। অতিথিসৎকারে এই সামান্য গৃহস্থ-পরিবারের সকলেরই অসামান্য উৎসাহ ছিল।

দীনদয়াল বলিতেন, "বলে ছলে বামনে খায়, তার ফলে স্বর্গে যায়। যা হ'ক, অতিথি ব্রাহ্মণ সন্তানেরা যে এই দীন দরিদ্রের কুটিরে আসিয়া দু'মুটো অন্ন পান, ইহাই আমার পরম সৌভাগ্য।" নাগমহাশয় বলিতেন, "এ সকলই ঠাকুরের লীলা। ঠাকুর লীলাশরীরে এক ছিলেন, ইদানীং তিনিই আবার নানা মূর্তিতে আমাকে কৃপা করিতে আসিয়াছিলেন।" তিনি যথার্থ নারায়ণজ্ঞানে অতিথির সেবা করিতেন।

একদিন নাগমহাশয়ের শূলবেদনা ধরিয়াছে, যন্ত্রণায় মধ্যে মধ্যে অজ্ঞান হইয়া পড়িতেছেন। গৃহে চাল নাই, দৈবাৎ আট-দশ জন লোক আসিয়া পড়িল। সেই অসুখেই তিনি বাজারে চলিয়া গেলেন। তিনি কখন মুটের দ্বারায় মোট বহাইতেন না। হাট-বাজার করিয়া আপনিই মাথায় করিয়া আনিতেন। সেইদিন চালের মোট মাথায় করিয়া আনিতে আনিতে তাঁহার বেদনাবৃদ্ধি হইল, চলিতে চলিতে পথে পড়িয়া গিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায় হায়, রামকৃষ্ণদেব আজ কি করিলেন! গৃহে নারায়ণ উপস্থিত, তাঁহাদের সেবায় বিলম্ব হইল। ধিক্ এ হাড়মাঁসের খাঁচায়, যদ্দ্বারা আজ ভগবানের সেবা হইল না।" বেদনার একটু উপশম হইলে মোট মাথায় লইয়া তিনি বাড়ী আসিলেন। উপস্থিত অতিথি-দিগকে প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন, "হায়, হায়, আপনাদের নিকটে অপরাধী হইলাম। আপনাদের সেবার বিলম্ব হইল!"

কোনদিন রাত্রে পাঁচ-ছয় জন হবিষ্যাশী অতিথি উপস্থিত, কিন্তু নাগমহাশয়ের ঘরে আতপ তণ্ডুলের অভাব। দোকানপাট তখন বন্ধ হইয়াছে, মাতাঠাকুরাণী ডালা হাতে করিয়া আতপ

চাউল ধার করিতে বাহির হইলেন। আমরা তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতাম। নাগমহাশয় আমাদিগকে বুঝাইতেন, "এ সকলই ঠাকুরের ইচ্ছা, ঠাকুরের দয়া, আমার পরীক্ষামাত্র।"

একদিন বর্ষাকালে তাঁহার গৃহে দুই জন অতিথি আসিয়া উপস্থিত। সেই দিন ঘোর দুর্যোগ, বর্ষার বিরাম নাই। নাগমহাশয়ের বাটিতে মোটে চারিখানি ঘর ছিল, তাহার তিনখানির চাল দিয়া জল পড়িতেছে। একখানি ঘর ভাল ছিল, নাগমহাশয় তাহাতে শয়ন করিতেন। অতিথিদ্বয়ের আহারাদি হইল, কিন্তু শয়নের স্থান কোথায় হয়? নাগমহাশয় মাতাঠাকুরাণীকে বলিলেন, "আজ আমাদের পরম সৌভাগ্য। এই সমস্ত সাক্ষাৎ নারায়ণের জন্য একটু সহিতে পারিবে না? এস, আমরা ঘরের কানাচে বসিয়া ঠাকুরের নাম করিতে করিতে রাত্রিযাপন করি।" অতিথিদের ঘর ছাড়িয়া দিয়া, দুই জনে ঘরের কানাচে বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণনামে রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

সামান্য গৃহস্থের মাসিক আয়ব্যয় যেমন নির্ধারিত থাকে, নাগমহাশয়ের সেরূপ ছিল না। কুতের কার্যে সকল বৎসর সমান লাভ পাইতেন না এবং অতিথির সংখ্যাও নির্দিষ্ট ছিল না। সেইজন্য সংসারে সময়ে জিনিসপত্রের অভাব হইয়া পড়িত। যখন যে দ্রব্যের অনটন হইত, নাগমহাশয় নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানের পরিচিত দোকানদারদিগের নিকট হইতে তাহা ধারে আনাইয়া লইতেন এবং বৎসরান্তে রণজিতের প্রেরিত টাকা পাইলে তাহাদিগকে প্রাপ্য যতদূর সাধ্য চুকাইয়া দিতেন। বাজারে নাগমহাশয়ের যেরূপ সম্ভ্রম ছিল, অনেক ধনী মহাজনের ভাগ্যে সেরূপ ঘটিত না।

নাগমহাশয়ের নিয়ম ছিল, এক দোকান হইতে জিনিস লইতেন; বলিতেন, "সত্যের আঁট থাকিলে সত্যই তাহাকে সর্বদা রক্ষা করেন, ভগবান তাহাকে অবশ্যই কৃপা করেন।" যাহার কাছে তিনি দ্রব্যাদি কিনিতেন সে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত। যে মূল্যে অন্য ক্রেতাকে সে জিনিস দিত, নাগমহাশয়কে তাহা অপেক্ষা বেশী দিত। নাগমহাশয় তাহা জানিতে পারিলে বলিতেন, "অন্যকেও যা দেন আমাকেও তাই দেবেন, বেশী দেবেন না।" বাজারে ধারণা ছিল—নাগমহাশয় ভারি পয়মন্ত, যে দিন তাঁহার হাতে প্রথম বউনি হইবে সেদিন নিশ্চয় বেশী বিক্রয় হইবে। মেছুনি মাছ গছাইবার জন্য, গোয়ালা দুধ বেচিবার জন্য তাঁহাকে সাধ্যসাধন করিত। একদিন অতিরিক্ত দুগ্ধের প্রয়োজন হওয়াতে এক গোয়ালার কাছে তিনি তাহা কিনিলেন এবং হাতে তখন খুচরা পয়সা না থাকায় গোয়ালাকে একটি টাকা দিলেন। নাগমহাশয় কখনও বাকি প্রাপ্য ফেরত চাহিতেন না। তিনিও চাহিলেন না, গোয়ালাও বাকী পয়সা ফেরত দিল না। আর একদিন সেই গোয়ালার কাছে দুগ্ধ কিনিয়া নাগমহাশয় সে দিনের নগদ দাম চুকাইয়া দিলেন, বাকি পয়সার কথা কিছুই বলিলেন না। গোয়ালা ভাবিল, এ পাগল মানুষ, হয়ত ভুলিয়া গিয়াছে। সে বাকির কথা তুলিল না, সেই দিনের নগদ দাম লইয়া গেল।

আমি কখন কখন তাঁহার সঙ্গে বাজারে গিয়াছি। নাগমহাশয় কখনও দর-দস্তুর করিতেন না; দোকানী যে দর বলিত, সেই দর দিতেন। নাগমহাশয়কে দর্শন করিতে আসিয়া একবার এক ব্যক্তি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়েন। নাগমহাশয় অতি যত্ন করিয়া রোগীর

শুশ্রূষা করিলেন। সে আরোগ্য লাভ করিলে তাহাকে বাড়ী পাঠাইবার জন্য তাঁহাতে ও আমাতে একদিন নৌকাভাড়া করিতে গেলাম। মাঝি যাহা চাহিল তাহা নিতান্ত অসঙ্গত বোধ হওয়ায় আমি বকাবকি আরম্ভ করিলাম, নাগমহাশয় আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিলেন, "অনর্থক বিবাদে প্রয়োজন কি? ইহারা কখন মিথ্যা কথা বলে না।" মাঝি যে ভাড়া চাহিয়াছিল, তাহাই স্থির হইল। রোগীকে আনিয়া উঠাইয়া দিলাম। তাঁহার নিকট সম্বল কিছু ছিল না। নাগমহাশয় তাঁহার ভাড়া দিলেন তাঁহাকে এমন অনেকেরই পথ-খরচ দিতে হইত।

এইরূপ অপরিমিত ব্যয়ে নাগমহাশয়কে কিছু ঋণগ্রস্ত হইতে হইল। তাঁহার সেই ঋণ পরিশোধ করিয়া দিতে চাহিলে, নাগমহাশয় সম্মত হইলেন না। পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে আসিয়া নাগমহাশয়ের ঋণের কথা শুনিয়া সাহায্য করিবার প্রস্তাব করেন। নাগমহাশয় বলিলেন, "সন্ন্যাসিগণ যে আমাকে কৃপা করেন, এই যথেষ্ট। যা হক করে পালবাবুদের প্রদত্ত অর্থ দ্বারাই আমার সংসার এক প্রকার সুখে দুঃখে চলে যাবে।" ঋণের জন্য আমাদের চিন্তিত দেখিলে তিনি বলিতেন, "না মিলে নাই বা খাব, তবু গৃহস্থের ধর্ম্মত্যাগ করতে পারব না। আপনাদের ওসব ছাইভস্ম ভাববার প্রয়োজন নেই! ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যা হয় করবেন।"

নাগমহাশয় কখন চাকর রাখিতেন না। তিনি দেশে থাকিতে লোক নিযুক্ত করিয়া গৃহসংস্কার করিবার জো ছিল না। নাগমহাশয় যখন স্থানান্তরে থাকিতেন, মাতাঠাকুরাণী সেই সময় জঙ্গল

কাটাইয়া, চাল ছাওয়াইয়া গৃহসংস্কার করাইয়া রাখিতেন। একবার নাগমহাশয় দীর্ঘকাল দেশে থাকায়, তাঁহার সমস্ত ঘরগুলি অব্যবহার্য হইয়া পড়িয়াছিল, চাল দিয়া জল পড়িত। ঘর নূতন করিয়া ছাওয়াইবার জন্য মাতাঠাকুরাণী একজন ঘরামী নিযুক্ত করিলেন। ঘরামী বাটীতে প্রবেশ করিবামাত্র নাগমহাশয় 'হায় হায়' করিতে লাগিলেন ; তাহাকে বসাইয়া তামাক সাজিয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে ঘরামী চালে উঠিয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিল। 'হায় হায়' করিতে করিতে নাগমহাশয় তাহাকে নামিয়া আসিতে বলিলেন, বিনয় করিতে লাগিলেন, কিন্তু ঘরামী কিছুতেই নামিল না। তখন আর নাগমহাশয় স্থির থাকিতে পারিলেন না, কপালে করাঘাত করিতে করিতে বলিলেন, "হায়! ঠাকুর, তুমি কেন আমায় এই গৃহাস্থাশ্রমে থাকিতে আদেশ করিয়া গেলে! আমার সুখের জন্য অন্য লোকে খাটিবে, ইহা আমাকে দেখিতে হইল! ধিক্ এ সংসারাশ্রমে!" তাঁহার ব্যাকুলতা দেখিয়া ঘরামী নামিয়া আসিল। সে নামিবামাত্র নাগমহাশয় আবার তামাক সাজিয়া দিয়া তাহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। তাহার শ্রান্তিদূর হইলে সমস্ত দিনের প্রাপ্য চুকাইয়া দিয়া বিদায় দিলেন।

নৌকায় উঠিয়া নাগমহাশয় মাঝিকে নৌকা চালাইতে দিতেন না, আপনি লগি ধরিয়া বাহিয়া যাইতেন। অপর আরোহিগণ তাঁহাকে ক্ষান্ত করিবার বিস্তর চেষ্টা করিত, নাগমহাশয় কাহারও কোন কথা শুনিতেন না। সেজন্য কেহ পারতপক্ষে তাঁহাকে নৌকায় উঠিতে দিত না। বর্ষাকালে দেওভোগ গ্রাম

জলপ্লাবিত হইয়া থাকে, নৌকা ব্যতীত এ-বাড়ী ও-বাড়ী যাওয়া যায় না। নাগমহাশয়ের নিজের নৌকা ছিল না। মাতাঠাকুরাণী প্রতিবাসিগণের সাহায্যে পূর্ব হইতেই জ্বালানী কাষ্ঠ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় নাগমহাশয় ধূপধুনা দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি আরতি করিতেন। ভক্তের সম্মিলন হইলে প্রায় সঙ্কীর্তন হইত। সঙ্কীর্তনের সঙ্গে নাগমহাশয় প্রায় যোগ দিতেন না, প্রাঙ্গণের একপাশে বসিয়া সকলকে তামাক সাজিয়া খাওয়াইতেন। তিনি উপস্থিত থাকিলে কীর্তনে মহাশক্তির আবির্ভাব হইত। কীর্তনান্তে নাগমহাশয় কেবল রামকৃষ্ণনামের জয়ধ্বনি করিতেন।

কেবল কীর্তনে কেন, নাগমহাশয়ের বাটীর সকল ক্রিয়া-কাজেই ভক্তির পূর্ণ উচ্ছ্বাস লক্ষিত হইত। এক বৎসর সরস্বতী পূজার দিন আমি তাঁহার বাটীতে উপস্থিত হই। তিনি মধ্যে মধ্যে আমার মুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনিতেন। একই শ্লোকের পৃথক ব্যাখ্যা শুনিয়া বলিতেন, "তাও বটে, আবার তাও বটে! যে যেমন অধিকারী তাহার জন্য শাস্ত্রের সেইরূপ ব্যাখ্যা হইয়াছে। ইহাতে ব্যাখ্যাকর্তাদের কোন দোষ নাই।" ঠাকুরের বহুরূপীর গল্প উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "ঈশ্বরের অনন্ত রূপ, যিনি যেমন বুঝিয়াছেন তিনি সেইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার কি যে স্বরূপ কেহই কিছু বলিতে পারে না।" তাহার পর মণ্ডপোপরি অবস্থিতা দেবীমূর্ত্তি দেখাইয়া বলিলেন, "এও সব সত্য। এই দেবদেবীর সাধনা করিয়া কত লোক মুক্ত হইয়া গিয়াছেন।" ইহা বলিয়া বার বার দেবীকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। দ্রব্যসম্ভারে

মণ্ডপ পরিপূর্ণ, পুরোহিত পূজা করিতেছেন। নাগমহাশয় পুনরায় দেবীমূর্তি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,—"মা যে সাক্ষাৎ বিদ্যারূপিণী! এঁর কৃপা না হলে কি কেহ অবিদ্যার পারে যাইতে পারে? মা আমাকে মূর্খ করিয়া খুদ্দুর শুদ্দুরের ঘরে আনিয়াছেন, আমাদের শাস্ত্রাধিকার নাই, আপনি শাস্ত্রের কথা ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে কৃপা করুন!" দেবতায় তাঁহার তাদৃশ দৃঢ়া ভক্তি দেখিয়া আমার তখন মনে হইয়াছিল—নাগমহাশয় বোধ হয় দেবতাসিদ্ধ, ব্রহ্মজ্ঞ নহেন। আমি এইরূপ ভাবিতেছি, ইতোমধ্যে তিনি কখন সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছেন। খুঁজিতে খুঁজিতে দেখি তিনি রান্নাঘরের পশ্চাতে আমগাছের তলায় দাঁড়াইয়া আছেন। তখন তাঁহার পূর্ণ ভাবাবেশ—তিনি বলিলেন, "মা কি আমার এই খড়ে-মাটিতে আবদ্ধ? তিনি যে অনন্ত সচ্চিদানন্দময়ী; মা যে আমার মহাবিদ্যাস্বরূপিণী!" ইহা বলিতে বলিতে তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন। প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে সমাধিভঙ্গ হয়। পরে মাতাঠাকুরাণীকে আমি এই কথা জানাইলে তিনি বলিয়াছিলেন, "বাবা, তুমি ত তাঁহার এই অবস্থা আজ নূতন দেখিলে। এক একদিন দুই-তিন প্রহরেও তাঁহার চেতনা হয় না। এক একদিন আমার মনে হয় তিনি দেহ ছাড়িয়া বুঝি বা চলিয়া গেলেন!"

কখন কখন বহুলোকসমাগম দেখিয়া তিনি "মা! এ কি হল!" বলিয়া প্রচ্ছন্নভাবে কলিকাতায় পলাইয়া যাইতেন। ইহা ভিন্ন শ্রীরামকৃষ্ণভক্তগণকে দেখিবার জন্য যখনই মন ব্যাকুল হইত, তখনই তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসিতেন। এতদ্ব্যতীত

প্রতি বৎসরের ৺দুর্গাপূজার পূর্বে কলিকাতায় পূজার বাজার করিতে আসিতেন।

একবার নবদ্বীপ হইতে দুইজন সাধু প্রত্যাদিষ্ট হইয়া নাগমহাশয়কে দর্শন করিতে দেওভোগে আগমন করেন। কিন্তু তিনি তখন দেশে না থাকায় তাঁহারা তিনদিন দেওভোগে অবস্থান করিয়া পুনরায় নবদ্বীপে চলিয়া যান। এই ঘটনাটি মাতাঠাকুরাণীর প্রমুখাৎ অবগত হওয়া গিয়াছে।

স্বামী তুরীয়ানন্দ জ্ঞানানন্দকে সঙ্গে লইয়া নাগমহাশয়কে দর্শন করিতে একবার দেওভোগে আসেন। তখন বর্ষাকাল, মাঠ পথ ডুবিয়া গিয়া দেওভোগ গ্রাম এক অখণ্ড জলরাশিতে পরিণত হইয়াছে। স্বামিদ্বয় নৌকাযোগে একেবারে নাগমহাশয়ের বাটীর ভিতরে আসিয়া উপস্থিত। নাগমহাশয় তাঁহাদিগকে দেখিয়াই 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ' বলিতে বলিতে জলে লাফাইয়া পড়িলেন—একেবারে সংজ্ঞাহীন! স্বামিদ্বয় যত্ন করিয়া তাঁহাকে জল হইতে তুলিলেন।

আমেরিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্বামী বিবেকানন্দের একবার ইচ্ছা হইয়াছিল দেওভোগে আসিয়া পল্লী-জীবনের সুখ-স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করিবেন। তথাকার লোকব্যবহার-অনুযায়ী স্নান-শৌচাচার করিবেন। নাগমহাশয় স্বামীজির জন্য শৌচস্থান প্রভৃতি যত্নে প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন; কিন্তু তিনি জীবিত থাকিতে স্বামীজির দেওভোগে শুভাগমন হয় নাই।

গৃহস্থাশ্রম ও গুরুস্থান

কলিকাতায় আসিয়া নাগমহাশয় সর্ব্বাগ্রে কালীঘাটে গিয়া কালীদর্শন করিতেন, তাহার পর কুমারটুলীর বাসায় কাপড়ের পুঁটুলিটি রাখিয়া ধূলাপায়ে গিরিশবাবুর বাটীতে যাইতেন। তিনি বলিতেন, "পাঁচ মিনিটকাল গিরিশবাবুর নিকট বসিলে জীবের ভবরোগ দূর হয়।" আবার বলিতেন, "গিরিশবাবুর এমনি বুদ্ধি যে দৃষ্টিমাত্র লোকের অন্তস্তল দেখিতে পান। এই বুদ্ধিবলেই গিরিশবাবু সর্ব্বাগ্রে ঠাকুরকে অবতার বলিয়া চিনিয়াছিলেন।" গিরিশের নাম হইলেই নাগমহাশয় সসম্ভ্রমে প্রণাম করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণভক্তগণের মধ্যে গিরিশকে তিনি অতি উচ্চাসন দিতেন।

নাগমহাশয় একবার পূজার পূর্বে কলিকাতায় আসিলে আমি তাঁহার সঙ্গে গিরিশবাবুর বাটীতে যাই। নাগমহাশয়কে দেখিয়া গিরিশবাবু উপর তল হইতে নীচে নামিয়া আসিলেন এবং সমাদরে আমাদের উপরে লইয়া গেলেন। নাগমহাশয় বিছানায় বসা ত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি মেজেতে বসিলে উপস্থিত ভদ্রলোকগণ বারংবার তাঁহাকে বিছানায় বসিতে বলিলেন। গিরিশবাবু বলিলেন, "ওকে বিরক্ত করবার আবশ্যক নেই। উনি যাতে সুখী হন সেইরকম করে বসুন।" নাগমহাশয় বসিলে গিরিশবাবু তাঁহাকে ঠাকুরের কথা বলিতে বলিলেন।

নাগমহাশয়— আমি মূর্খ দুরাচার, তাঁহাকে চিনিলাম কই? আপনি কৃপা করুন যাহাতে ঠাকুরের পাদপদ্মে আমার ভক্তি হয়।

নাগমহাশয়ের দীনতা দেখিয়া উপস্থিত ভদ্রলোকগণ নীরবে বসিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। গিরিশ বলেন, "তা নইলে কি আর ঠাকুর বলে মানি? যাঁর কৃপাগুণে মানুষের এমন অবস্থা হয়, তাঁকে কি ভগবান না বলে থাকা যায়!" শ্রীরামকৃষ্ণসম্বন্ধে নানাবিধ প্রসঙ্গ হইবার পর আমরা বিদায় লইলাম।

এক রবিবারে সুরেশকে ও আমাকে সঙ্গে করিয়া তিনি আলমবাজার মঠে গমন করেন। সেদিন সেথায় স্বামী তুরীয়ানন্দ, নির্মলানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, প্রেমানন্দ, ত্রিগুণাতীত প্রভৃতি অনেকে উপস্থিত ছিলেন। নাগমহাশয় সকলকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পাইয়া মঠে এক হর্ষ-কোলাহল পড়িয়া গেল। আমরা যখন উপস্থিত হই, তখন রামকৃষ্ণানন্দ আরতি করিতেছিলেন। সন্ধ্যারতির সময় নাগমহাশয় কাঁসর বাজাইলেন, তাহার পর আমরা প্রসাদ পাইতে বসিলাম। কাশীপুরের বাগানে প্রসাদের পাতা খাওয়া অবধি নাগমহাশয়কে আর পাতায় প্রসাদ দেওয়া হইত না, থালায় প্রসাদ দেওয়া হইল। প্রসাদগ্রহণান্তে নাগমহাশয় উচ্ছিষ্ট বাসন মাজিয়া আনিলেন, কাহারও বারণ শুনিলেন না। বাসন মাজিয়া নাগমহাশয় স্বামিগণকে তামাক সাজিয়া দিলেন। সেই রাত্রি আমরা মঠেই যাপন করিলাম। ভয়ানক গরম, সুরেশচন্দ্র ও আমি ছাদে গিয়া শয়ন করিলাম; নাগমহাশয় সারারাত্রি বসিয়া কাটাইলেন। পরদিন প্রাতে আমরা মঠ হইতে বিদায় লইলাম। মঠে আমার এই প্রথম গমন। স্বামিগণ আমাকে মধ্যে মধ্যে সেথায় যাইতে বলিয়া দিলেন।

নাগমহাশয় অনেক দিন দক্ষিণেশ্বর দেখেন নাই; একদিন

সুরেশকে ও আমাকে সঙ্গে করিয়া তিনি তথায় গমন করিলেন। পথে ঠাকুরের শেষ লীলাস্থল কাশীপুরের বাগান সুরেশ আমাকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইতেছিলেন। কাশীপুরের নাম শুনিলে নাগমহাশয়ের মর্মযন্ত্রণা হইত; তিনি শিহরিয়া উঠিতেন। সে বাগানের পানে ফিরিয়া চাহিলেন না, কিন্তু তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। শ্রীরামকৃষ্ণের গলনালী-পীড়ায় দেহান্ত হইবার কথা উত্থাপন হওয়ায় নাগমহাশয় বলিয়া উঠিলেন, "লীলা, লীলা! জীবের উদ্ধারকল্পে লীলার্থই রোগধারণ করিয়াছিলেন।" ইহার পরে নাগমহাশয় জীবনে আর এই বাগানের পথে আসেন নাই।

যথাসময় আমরা দক্ষিণেশ্বরে পৌছিলাম। ফটকের সম্মুখে নাগমহাশয় সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিলেন। দক্ষিণেশ্বর আমি পূর্বে আর দেখি নাই; সুরেশ শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাস্থল বিল্বমূল, পঞ্চবটী প্রভৃতি একে একে আমাকে দেখাইতে লাগিলেন। নাগমহাশয় যন্ত্রচালিতবৎ আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন, তাঁহার মন কোথায় ছিল বলিতে পারি না। অবশেষে আমরা ঠাকুরের কক্ষাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। ঘরের নিকটে আসিয়াই নাগমহাশয় "হা ঠাকুর, কি দেখিতে আসিলাম!" বলিয়া আছড়াইয়া পড়িলেন। আমি তাঁহাকে ধরিয়া তুলিলাম, কিন্তু কোনমতেই ঠাকুরের ঘরের ভিতর লইয়া যাইতে পারিলাম না। বলিলেন, "আর কি দেখতে যাব? এ জন্মের মত দেখাশুনা সব হয়ে গেছে।" ইহজীবনে আর তিনি এ ঘরে প্রবেশ করেন নাই। যখন দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন, দূর হইতে সেই কক্ষকে প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিতেন। আজ ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় মুখোপাধ্যায়ও দক্ষিণেশ্বরে আসিয়াছেন।

তাঁহার সঙ্গে একটি কাপড়ের মোট ছিল, চেহারা অতি মলিন। নাগমহাশয় বলিলেন, "হৃদয় এখন ফেরি করিয়া কাপড় বেচিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করেন।" তাঁহার সহিত নাগমহাশয়ের পরিচয় ছিল, দুজনে শ্রীরামকৃষ্ণকথা কহিতে লাগিলেন। ঠাকুরের কক্ষের সম্মুখে বসিয়া হৃদয় তিন-চারিটি শ্যামাবিষয়ক গান করিলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, "ঠাকুর ঐ গানগুলি গাহিতেন।" অনেক কথার পর হৃদয় বলিতে লাগিলেন, "তোমরা তাঁহার কৃপায় সব কেমন হইয়া গেলে, আমাকে এখনও ফেরি করিয়া উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়! মামা আমাকে কৃপা করিলেন না।" এই বলিয়া তিনি বালকের ন্যায় অশান্ত হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরিবার পথে আমরা আলমবাজার মঠে গেলাম এবং তথায় ঠাকুরের বৈকালিক প্রসাদ গ্রহণ করিলাম। স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আমাদের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ করিতে করিতে অনেক পথ আসিলেন। তাঁহার কাছে বিদায় লইয়া আমরা গিরিশ বাবুর বাড়ী যাই। তাহার পর নাগমহাশয় বাসায় ফিরিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত-জননী শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী এই সময়ে বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর গঙ্গাতীরস্থ বাগানবাটীতে বাস করিতেছিলেন। এক রবিবার আমাকে লইয়া নাগমহাশয় মাকে দর্শন করিতে গমন করেন। কুমারটুলীর বাসায় গিয়া দেখিলাম নাগমহাশয় মায়ের জন্য কিছু উৎকৃষ্ট সন্দেশ ও একখানি লাল নরুনপেড়ে কাপড় কিনিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিয়া আছেন এবং মধ্যে মধ্যে বালকের ন্যায় "মা মা" করিতেছেন। কুমারটুলী হইতে আহিরীটোলায় গিয়া আমরা একখানি চল্‌তি নৌকায়

উঠিয়া কিছুক্ষণের মধ্যে বেলুড়ে পৌঁছিলাম। ঘাটে পৌঁছিয়াই নাগমহাশয় বাতাহত কদলীপত্রের ন্যায় কাঁপিতে লাগিলেন। "জয় মা—জয় মা" বলিতে বলিতে তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া পড়িতে লাগিল। স্বামী প্রেমানন্দ দূর হইতে নাগমহাশয়কে দেখিতে পাইয়া মাকে সংবাদ দিয়া রাখিয়াছিলেন। আমরা উপরে উঠিবামাত্র তিনি নাগমহাশয়কে ধরিয়া ধরিয়া মায়ের নিকট লইয়া গেলেন। প্রায় আধঘণ্টা পরে তাঁহারা মায়ের নিকট হইতে বাহিরে আসেন। তখনও নাগমহাশয় ভাবের ঘোরে বলিতেছেন, "বাপের চেয়ে মা দয়াল। বাপের চেয়ে মা দয়াল।" স্বামী প্রেমানন্দ বলিলেন, "আহা! আজ নাগমহাশয়ের উপর মা কি কৃপাই করিয়াছেন! নাগমহাশয়ের সন্দেশ মা নিজ হাতে তুলিয়া খাইয়া স্বহস্তে তাঁহাকে প্রসাদ খাওয়াইয়া দিলেন, তাহার পর পান দিলেন!" কিছু পরে আমরা বিদায় লইলাম। সেইদিন আমার ভাগ্যে শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণদর্শন ঘটে নাই।

দেশে ফিরিয়া যাইবার পাঁচ-সাত দিন পূর্বে নাগমহাশয় আমাকে লইয়া আর একবার আলমবাজার গমন করেন। বেলা প্রায় এগারটার সময় কুমারটুলী গিয়া দেখি নাগমহাশয়ের তখনও আহার হয় নাই। সেদিন আর আহার হইল না, আমি যাইতেই আমার সঙ্গে বাহির হইয়া পড়িলেন। ঠাকুরের জন্য পথে ফলমূল মিষ্টান্ন কিনিয়া লওয়া হইল। বেলা প্রায় দেড়টার সময় আমরা মঠে পৌঁছিলাম। তখন স্বামিগণ আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, ঠাকুর শয়নে। নাগমহাশয়ের আহার হয় নাই শুনিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ও প্রেমানন্দ তাড়াতাড়ি

উঠিয়া তাঁহার জন্য লুচি প্রস্তুত করিলেন। ঠাকুরকে শয়ন হইতে উঠাইয়া ভোগ দেওয়া হইল। নাগমহাশয়ের নিষেধ কেহ মানিল না। তাঁহাকে প্রসাদ দিলে তিনি "জয় রামকৃষ্ণ" বলিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। আমরা প্রসাদ পাইলাম। ঠাকুরের পরিচর্যার বিধিব্যবস্থায় তিলমাত্র ব্যতিক্রম হইলে যিনি মহা রুষ্ট হইতেন, সেই স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ কর্তৃকই আজ নাগমহাশয়ের জন্য মঠের সেই অলঙ্ঘনীয় নিয়ম—যাহার ব্যতিক্রম কখন কোন রাজাধিরাজের খাতিরে পর্যন্ত লক্ষিত হয় নাই, সে নিয়ম ভঙ্গ হইল। আমরা সন্ধ্যার পর মঠ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলাম। ইহার কিছুদিন পরেই পূজার বাজার করিয়া নাগমহাশয় দেশে গমন করেন।

শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত-জননী শ্রীশ্রীমা নাগমহাশয়কে একখানি বস্ত্র দিয়াছিলেন, নাগমহাশয় সেই বস্ত্রখানি মাথায় বাঁধিয়া পূজার বাজার করিতে যাইতেন। কোন একটি ভক্তের অনুরোধে মায়ের আরতির জন্য রৌপ্যদণ্ডযুক্ত একটি শ্বেতচামর কেনা হইল। পালবাবুদের নিকট হইতে কুতের কার্যের লাভাংশস্বরূপ নাগমহাশয় প্রতিবৎসর যে অর্থ পাইতেন তাহাতে পূজার বাজার করা হইত। বাজার শেষ করিয়া নাগমহাশয় গাড়ীতে উঠিলেন। একটি ভক্ত তাঁহাকে রেলগাড়ীতে তুলিয়া দিতে যায়। নাগমহাশয়ের জিনিসপত্র গাড়ীতে তুলিয়া দিবার সময় ভক্ত তাহার ছাতাটি গাড়ীতে রাখিয়াছিল, আসিবার সময় তাড়াতাড়িতে সে ছাতাটি গাড়ীতে ফেলিয়া আসে। নাগমহাশয় ভক্তের ছাতা জানিতে পারিয়া তাহা সাবধান করিয়া রাখিতে গেলেন, কিন্তু একটি ভদ্রলোক ছাতাটি তাহার বলিয়া দখল করিয়া লইল। নাগমহাশয়

বিস্তর প্রতিবাদ করিলেন, কোন ফল হইল না। গাড়ী চলিতে চলিতে লোকটি ক্রমে ঘুমাইয়া পড়িল। তাহার যে ষ্টেশনে নামিবার কথা ছিল তাহা পার হইয়া গেল, কিন্তু লোকটির ঘুম ভাঙ্গিল না। তিন-চার ষ্টেশন পরে লোকটি জাগিয়া উঠে এবং সঙ্গে বেশী সম্বল না থাকায় অতিরিক্ত ভাড়া দিতে অক্ষম হইলে, ষ্টেশন মাষ্টার তাহাকে আটক করিয়া রাখেন। এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া নাগমহাশয় বলিয়াছেন, "অন্যায় কার্যের ফল হাতে হাতে পাওয়া যায়, তবু কিন্তু মানুষের হুঁশ হয় না।"

ঐ গাড়ীতে অপর একটি লোক এক বারবিলাসিনীকে লইয়া যাইতেছিল; নাগমহাশয় বলেন, ইহাদের উপর দৃষ্টিপাত হইতেই তিনি দেখিলেন—এক পিশাচী-মূর্তি ঐ লোকটির ঘাড়ে কামড়াইয়া রক্তপান করিতেছে। দেখিতে দেখিতে লোকটির সমস্ত মাংস নিঃশেষ হইয়া কেবলমাত্র অস্থিগুলি পড়িয়া রহিল। নাগমহাশয় চমকিত হইয়া "মা মা" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তিনি বলিতেন, "সত্যি সত্যি এ সব সাদা চোখে দেখেছিলাম!"

এবার পূজার পরে আবার শীঘ্রই নাগমহাশয় কলিকাতায় আসেন।

এবার তিনি সুরেশবাবুকে এবং আমাকে সঙ্গে লইয়া মধ্যে মধ্যে আলমবাজার মঠে, দক্ষিণেশ্বরে এবং গিরিশবাবুর বাটীতে যাইতেন। কুমারটুলীর বাসায় অনেক লোক তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত। কেহ কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিলে নাগমহাশয় অস্থির হইয়া বলিতেন, "কি ছাই এ হাড়মাংসের খাঁচা দেখিতে আসিয়াছেন? ঠাকুরের কথা বলিয়া আমার প্রাণ শীতল করুন।"

গিরিশবাবু মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। গিরিশবাবুর অন্ন তিনি অতি সমাদরে গ্রহণ করিতেন; বলিতেন, "গিরিশবাবুর প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করিলে তাঁহার শরীর মন শুদ্ধ হইয়া যাইবে।" পরমহংসদেবের কোন ভক্তের বাড়ীতে নাগমহাশয় অন্নগ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না; শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্ত-সম্বন্ধে তিনি কোনরূপ বর্ণাশ্রম বিচার করিতেন না; বলিতেন, "এই ভক্তসমাগম পুরুষোত্তমক্ষেত্রে অন্নসত্রের তুল্য।"

একদিন গিরিশবাবুর বাটীতে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইয়াছিল। ঠাকুরকে খেচরান্নভোগ দেওয়া হইয়াছে। নাগমহাশয় প্রসাদ পাইতে গিয়া দেখিলেন, তাঁহাকে একখানি পাতায় খিচুড়ি ও আর একখানি পাতায় ব্যঞ্জনাদি দেওয়া হইয়াছে। পৃথক পাতে ব্যঞ্জন দেওয়া হইয়াছে দেখিয়া নাগমহাশয় করজোড়ে বলিতে লাগিলেন, "এতে সুখ-ইচ্ছা হবে, সুখ-ইচ্ছা হবে" এবং অন্নের পাতায় কিছু কিছু ব্যঞ্জন লইয়া ব্যঞ্জনের পাতাটি তুলাইয়া দিলেন। তাহার পর গিরিশবাবুর সহিত প্রসাদ পাইতে বসিলেন। পাতে লবণ দিতে আসিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিলেন না; বলিলেন, "জিহ্বার স্বাদ-অনুভূতি হইবে।"

নাগমহাশয় কলিকাতায় থাকিলে গিরিশবাবু মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন। আর একদিন শ্রীযুত গিরিশের বাটীতে তাঁহার নিমন্ত্রণ হইল। সেদিন কই মাছের বেশ বড় ডিম পাওয়া গিয়াছিল। গিরিশবাবুর ইচ্ছা নাগমহাশয়কে কোনরূপে তাহা খাওয়াইবেন। সেই কথাই ভাবিতেছেন, এমন সময় নাগমহাশয় বলিলেন, "প্রসাদ দেন, প্রসাদ দেন!" ভগবান

শ্রীরামকৃষ্ণের ভক্তগণের প্রসাদ নাগমহাশয় অতি আগ্রহ-সহকারে বাছ্‌ঞা করিতেন, কিন্তু সেই মহাপুরুষকে প্রসাদ দিতে কেহ সাহস করিতেন না। গিরিশচন্দ্র কিন্তু এই সুযোগ ছাড়িলেন না। "জয় রামকৃষ্ণ—এই প্রসাদ নিন" বলিয়া আপনার পাত হইতে ডিম লইয়া নাগমহাশয়ের পাতে দিলেন। নাগমহাশয় সেই ডিম খাইতে খাইতে গিরিশবাবুকে বলিলেন, "বড় কৌশল করিয়াছেন, বড় কৌশল করিয়াছেন।"

শীতকালে শীতবস্ত্রের অভাবে নাগমহাশয়ের কষ্ট হইতেছে ভাবিয়া একবার গিরিশবাবু তাঁহাকে একখানি কম্বল পাঠাইয়া দেন। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ঐ কম্বল লইয়া গেলেন। গিরিশবাবু কম্বল দিয়াছেন শুনিয়া নাগমহাশয় কম্বলখানিকে বার বার প্রণাম করিতে লাগিলেন; তাহার পর উহাকে মাথার উপর তুলিয়া রাখিলেন। গিরিশবাবু জানিতেন নাগমহাশয় কাহারও কিছু গ্রহণ করেন না, শ্রীযুত দেবেন্দ্রের মুখে কম্বলগ্রহণের সংবাদ পাইয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু কিছু দিন পরে গিরিশবাবুর কানে উঠিল তাঁহার প্রদত্ত কম্বল নাগমহাশয় গায়ে দেন না, সর্বদা মাথায় করিয়া থাকেন। উৎকণ্ঠিত হইয়া গিরিশবাবু দেবেন্দ্রবাবুকে দেখিতে পাঠাইলেন। দেবেন্দ্রবাবু দেখিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন, নাগ-মহাশয় কম্বল মাথায় করিয়া বসিয়া আছেন।

কলিকাতায় তিন মাস বাস করিয়া নাগমহাশয় আবার দেশে চলিয়া গেলেন। দীনদয়ালের শরীর দিন দিন ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল। এখন হইতে নাগমহাশয় আর তত ঘন ঘন কলিকাতায় আসিতে পারিতেন না।

স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা হইতে প্রথম আসিবার পর আমি তাঁহাকে দর্শন করিতে যাই। নাগমহাশয়ের কাছে আমার যাতায়াত আছে শুনিয়া তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, "বয়ং তত্ত্বান্বেষাৎ হতা মধুকর (নাগ) ত্বং খলু কৃতী।"—তত্ত্বান্বেষণ করিতে করিতে আমাদের জীবন ব্যর্থ হইল। আমাদিগের মধ্যে একমাত্র নাগমহাশয়ই ঠাকুরের কৃতী সন্তান।" তাহার পর স্বামীজি নাগমহাশয়ের দেশে গিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং আমাকে সেইভাবে নাগমহাশয়কে পত্র লিখিতে বলেন।

স্বামীজির স্বদেশাগমনবার্তা পাইয়াই নাগমহাশয় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে কলিকাতায় আসেন। তখন বেলুড় মঠ প্রস্তুত হইয়াছে এবং স্বামী বিবেকানন্দ তথায় বাস করিতেছেন। অপরাহ্নে নাগমহাশয় আমার সহিত বেলুড়ে উপস্থিত হইলেন এবং স্বামীজিকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। স্বামীজির শরীর অসুস্থ শুনিয়া নাগমহাশয় অতিশয় বিচলিত হইয়া বলিলেন, "ঠাকুর বলিতেন—আপনি মোহরের বাক্স, এই দেহের রক্ষায় জগতের রক্ষা হইবে, জগতের মঙ্গল হইবে।" অনেক কথাবার্তার পর স্বামীজি তাঁহাকে মঠে বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। নাগমহাশয় বলেন, "কি করি! কেমন করিয়া ঠাকুরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করি, তিনি ত আমাকে গৃহেই থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন।" নাগমহাশয়ের সম্মানার্থে স্বামীজির আদেশে সে দিন মঠে ব্রহ্মচারি-সন্ন্যাসিগণের পাঠ বন্ধ রহিল। সকলে আসিয়া নাগমহাশয় ও স্বামীজিকে ঘেরিয়া বসিলেন। স্বামীজি রামকৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিবামাত্র নাগমহাশয়

দাঁড়াইয়া উঠিয়া উচ্চরবে 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে বলিলেন, "সেই দিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়া দেখিলাম, ঠাকুর ত তথায় নাই, ঠাকুর মঠে আসিয়া বসিয়াছেন।" মঠ-মন্দিরাদি প্রস্তুত করা ঠিক হইয়াছে কিনা স্বামীজি প্রশ্ন করিলে নাগমহাশয় বলিলেন, "ঠাকুরের ইচ্ছায় এই সব হইতেছে; ইহাতে জগতের ও জীবের মঙ্গল হইবে, মঙ্গল হইবে। শরীরের প্রতি নজর রাখিবেন, এই দেহের রক্ষায় জগতের মঙ্গল হইবে!" স্বামীজি উপস্থিত ভক্ত-সন্ন্যাসিগণকে বলিলেন, "ঈশ্বরের কৃপায় মানুষের যে এমন অবস্থা হতে পারে, তা একমাত্র নাগমহাশয়কে দেখেই বুঝতে পারা যায়। ত্যাগে, ইন্দ্রিয়-সংযমে ইনি আমাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ।" কিছু পরে নাগমহাশয়কে ঠাকুরঘরে লইয়া যাওয়া হইল। নাগমহাশয় 'শ্রীমন্দির, শ্রীমন্দির' বলিয়া দ্বার-সম্মুখে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

প্রতিদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্বামীজি মঠের জমিতে বেড়াইতেন। আজ নাগমহাশয়ও তাঁহার পিছনে পিছনে বেড়াইতে লাগিলেন। রাত্রে তাঁহার মঠে থাকা হইবে না শুনিয়া স্বামীজি বলিলেন, "বেলা শেষ হয়ে এল, তবে একখানা নৌকা দেখ।" বিদায়কালে নাগমহাশয় তাঁহাকে 'জয় শিব শঙ্কর, জয় শিব শঙ্কর' বলিয়া পুনরায় প্রণাম করিলেন। স্বামীজি তাঁহাকে হস্ত ধরিয়া উঠাইয়া বলিলেন, "মধ্যে মধ্যে এসে আমাদের দর্শন দিয়ে যাবেন, আমাদের কৃপা করবেন।" স্বামীজির নাম হইলেই তিনি 'জয় শিব শঙ্কর' বলিয়া অভিবাদন করিতেন। পশ্চিম ভূখণ্ডে স্বামীজির ধর্মপ্রচার ও দিগ্বিজয়ের কথা যখনই উঠিত, নাগমহাশয় অমনি 'মহাবীর মহাবীর' বলিয়া সিংহনাদ করিয়া উঠিতেন।

বাগবাজারের বলরাম বসুর বাটী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অতি প্রিয় স্থান ছিল। নাগমহাশয় ইহাকে 'শ্রীবাসের অঙ্গন' বলিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী ভক্তগণ কলিকাতায় আসিলে এইখানেই থাকিতেন। নাগমহাশয় মধ্যে মধ্যে তথায় গিয়া তাঁহাদিগকে দর্শন করিতেন। একদিন আমি তাঁহার সঙ্গে তথায় যাই। সে দিন স্বামী ব্রহ্মানন্দ ও স্বামী প্রেমানন্দ সেখানে ছিলেন। তাঁহারা বসিয়া বসিয়া নানাবিধ গল্প করিতেছিলেন। নাগমহাশয় উপস্থিত হইবামাত্র গল্প বন্ধ হইয়া গেল, কেবল শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ চলিতে লাগিল। আমরা বাসায় ফিরিবার সময় স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "নাগমহাশয় আসবামাত্র আমাদের কেমন ঠাকুরের কথা স্মরণ হল, অন্য সব কথা কোথায় চলে গেল। এমন মহাপুরুষের পদক্ষেপেই এখনও ভারতবর্ষে ধর্ম কর্ম জাগ্রত রয়েছে। ধন্য নাগমহাশয়!" শ্রীরামকৃষ্ণভক্তগণ-সম্বন্ধে নাগমহাশয় বলিতেন, "এঁরা সব মানুষের ছাল পরে ঠাকুরের সঙ্গে লীলা করতে জন্মগ্রহণ করেছেন! এঁদের কে চিনবে? কে চিনবে?"

দিনে দিনে দীনদয়ালের শেষ দিন উপস্থিত হইল। শেষ জীবনে তিনি সন্ধ্যা পূজা লইয়াই থাকিতেন, সর্বদা তুলসীর মালা জপ করিতেন। সংসারে আর তাঁহার কোন আসক্তি ছিল না। তাঁহার দেহেও কোনরূপ ব্যাধির আক্রমণ হয় নাই। একদিন প্রাতে নাগমহাশয় তাঁহাকে ধরিয়া আনিতেছিলেন, পথে হঠাৎ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। নাগমহাশয় পিতাকে ক্রোড়ে করিয়া বাটী লইয়া আসিলেন। আসিতে আসিতেই বৃদ্ধের জ্ঞানলোপ হইল। গৃহে আসিবার পর আবার চৈতন্য হইল বটে, কিন্তু নাগমহাশয়

বুঝিলেন, পিতার অন্তকাল উপস্থিত হইয়াছে। ডাক্তার আনিতে পাঠাইয়া পুত্র পিতাকে অবিরাম 'নাম' শুনাইতে লাগিলেন, তাঁহার সঙ্গে মুমূর্ষুর রসনাও যোগদান করিল! চিকিৎসক আসিলেন; রোগ—সন্ন্যাস, সাংঘাতিক। ডাক্তার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, বৃদ্ধের সময় সন্নিকট। ইহার কয়েক ঘণ্টা পরে ইষ্টনাম করিতেকরিতে, অশীতিবর্ষ বয়সে দীনদয়াল দেবলোকে গমন করিলেন। পিতৃবিয়োগে নাগমহাশয় কাতর হন নাই; বরং সজ্ঞানে তাঁহার দেহত্যাগ হইয়াছিল বলিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন।

নাগমহাশয় যথারীতি উত্তরীয় লইলেন; উপবাস করিয়া হবিষ্যাশী হইয়া শাস্ত্রনিয়মে দশপিণ্ড দান করিলেন। তারপর শ্রাদ্ধ—জীবনের এই শেষ কার্য, নাগমহাশয়ের ইচ্ছা শ্রাদ্ধ একটু ঘটা করিয়া করেন, কিন্তু অর্থ কোথায়?

নাগমহাশয়ের সাহায্যার্থ নারায়ণগঞ্জের রেলি ব্রাদার্স অফিসের বাবুরা গোপনে চাঁদা তুলিতে লাগিলেন। লোকপরম্পরায় তাহা জানিতে পারিয়া নাগমহাশয় বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে বারণ করিয়া পাঠাইলেন এবং গ্রামস্থ এক মহাজনের কাছে বসতবাটী বন্ধক দিয়া পাঁচশত টাকা কর্জ করিলেন। তাঁহার প্রতিবাসী চৌধুরীদিগের বৃদ্ধা গৃহিণীও এই শ্রাদ্ধোপলক্ষে মাতাঠাকুরাণীকে কিছু টাকা কর্জ দিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধে প্রায় বারশত টাকা ব্যয় হইয়াছিল।

পিতার সপিণ্ডীকরণ শেষ করিয়া নাগমহাশয় গয়াধামে গমন করিলেন। তারপর মস্তকমুণ্ডন করিয়া যথাবিধি তিন দিন পিণ্ডদান করিয়া কলিকাতায় আসিলেন। সুরেশবাবুকে তিনি

বলিয়াছিলেন যে, শেষ অবস্থায় তাঁহার পিতা সংসারের সকল বাসনা পরিত্যাগ করিয়া বিষয়-চিন্তা হইতে বিরত হইয়াছিলেন এবং সজ্ঞানে ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

পালবাবুরা শুনিলেন, নাগমহাশয় পিতৃকার্যে ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, দুইশত টাকা সেলামী লইয়া এবং ভাড়াবৃদ্ধি করিয়া কুমারটুলীর বাসায় নূতন প্রজা বন্দোবস্ত করা হউক। রণজিৎও সে প্রস্তাব অনুমোদন করেন, কিন্তু নাগমহাশয় কিছুতেই সম্মত হইলেন না। পুরাতন প্রজা কৃত্তিবাস নাগমহাশয়ের উদারতার কথা শুনিয়া স্বেচ্ছায় বেশী ভাড়া দিতে চাহিলে নাগমহাশয় বলিলেন, "আপনারা দিন রাত্রি পরিশ্রম করিয়া অতি সামান্য উপায় করেন, এই ভাড়া দিতেই আপনার কষ্ট হইতেছে, আমি কোনক্রমেই আর বেশী ভাড়া লইতে পারি না।" নাগমহাশয় কৃত্তিবাসকে সন্তানবৎ স্নেহ করিতেন। তিনি কলিকাতায় থাকিলে কৃত্তিবাসও অতি শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে তাঁহার সেবা করিত। কৃত্তিবাস এখনও সেই বাসায় বাস করিতেছে। নাগমহাশয়ের ব্যবহারের ঘর ও তাঁহার ভাঙ্গা তক্তাপোশখানি সে অতি যত্নে রক্ষা করে। মাতাঠাকুরাণী কখনও কলিকাতায় আসিলে সেই ঘরে বাস করেন।

'শ্রীশ্রীমা' এই সময় বাগবাজারে আসিয়াছিলেন। নাগমহাশয় একদিন মিষ্টান্ন ও কাপড় লইয়া তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু পথে তাঁহার বেদনা ধরিল, আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না, একটি বাটীর রোয়াকে অনেকক্ষণ অচেতন-প্রায় হইয়া পড়িয়া রহিলেন। গাড়ীভাড়া করিয়া অনায়াসে বাড়ী ফিরিতে

পারিতেন, সঙ্গে সম্বলও ছিল, কিন্তু মায়ের জন্য যাহা কিনিয়াছেন তাহা তাঁহাকে অর্পণ না করিয়া কেমন করিয়া বাড়ী ফিরিবেন। পড়িয়া পড়িয়া 'হায় হায়' করিতে লাগিলেন। প্রায় দুই ঘণ্টা পরে তাঁহার যন্ত্রণার উপশম হয়, তারপর শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিয়া রাত্রি ৯টার সময় তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসেন। ঐ দিনের পূর্ব্ব দিনও নাগমহাশয় শূলবেদনায় নিদারুণ যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিলেন।

সে বৎসর কলিকাতায় প্লেগের প্রথম আবির্ভাব। ধনী নির্ধন সকলে রাজধানী ছাড়িয়া পলাইতেছে, মহানগরী প্রায় জনশূন্য। পালবাবুরা কলিকাতার বাটীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার নাগমহাশয়ের উপর দিয়া দেশে চলিয়া গিয়াছেন, কেবল একজন পাচক ব্রাহ্মণ, একজন ব্রাহ্মণ মুহুরি ও একটি চাকর কলিকাতার বাটীতে আছে। আমি একদিন নাগমহাশয়ের সন্ধানে গিয়া দেখি, তিনি পালবাবুদের বাটীতে বসিয়া চশমা চোখে দিয়া গীতা পাঠ করিতেছেন। আমাকে তথায় দেখিয়া তিনি বলিলেন, "আমি গীতার কি বুঝি? আপনি ব্রাহ্মণ, পণ্ডিতলোক; এ সকলে আপনারই অধিকার; আমি হাঁদা লোক, গীতা পাঠ করিয়া আমাকে শুনান।" গীতার "কর্ম্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ" শ্লোকটির পাঁচরকম ব্যাখ্যা আমি তাঁহাকে শুনাইলাম। সকল প্রকার অর্থ শুনিয়া তিনি শ্রীধর স্বামীর টীকারই সর্বাপেক্ষা প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ইহার তিন দিন পরে ব্রাহ্মণ মুহুরিটির প্লেগ হয়। চিকিৎসার জন্য একজন ডাক্তার আসিলেন। কিন্তু সেবাশুশ্রূষা করে কে? প্লেগের রোগীকে কেহ ছুঁইত না। নাগমহাশয় একা রোগীর সেবাশুশ্রূষা করিতেন এবং তাহাকে পথ্যৌষধাদি দিতেন। ইতোমধ্যে আমি একদিন

তাঁহার কাছে গেলে তিনি বলিলেন, "এখন পাঁচ সাত দিন যেন এখানে আর না আসা হয়।"

আমি—আপনি যখন রহিয়াছেন, তখন আমার ভয় কি?

নাগমহাশয়—লোক-ব্যবহার মানিয়া চলিতে হয়। সংক্রামক ব্যাধি, সুতরাং কয়েক দিন এখানে আসা উচিত নহে।

ব্রাহ্মণটি ঐ দিনই মারা যায় এবং মৃত্যুর পূর্বে গঙ্গায় লইয়া যাইবার জন্য জেদ করে; লোকাভাবে নাগমহাশয় একাই তাহাকে ধরিয়া নিকটবর্তী গঙ্গার ঘাটে লইয়া যান। তথায় অল্পক্ষণ পরেই 'গঙ্গা গঙ্গা' বলিতে বলিতে নাগমহাশয়ের ক্রোড়ের উপর ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। নাগমহাশয় পালবাবুদের বাড়ীর চাকরকে শবের কাছে রাখিয়া সৎকার করিবার জন্য ব্রাহ্মণের অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। প্লেগে মৃত্যু, সৎকার করিতে কেহ চায় না, অবশেষে প্রতিজনকে চার টাকা করিয়া পারিশ্রমিক দিতে স্বীকার করিয়া বহুকষ্টে চার পাঁচ-জন লোক সংগ্রহ করিলেন। এই সৎকার্যে নাগমহাশয়ের সর্বসাকুল্যে প্রায় পঁচিশ টাকা ব্যয় হইয়াছিল। বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেন, আশুতোষ চৌধুরী ও নরেন্দ্রনাথ বসু ঐ দিন নাগমহাশয়কে দর্শন করিতে গিয়া ঐখানে গিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু ও আশুতোষবাবু নাগমহাশয়ের কার্য দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন; কেবল নরেন্দ্র বসুজ বলিলেন— "ইনি বদ্ধপাগল!" এই সময় নাগমহাশয় একদিন কালীঘাটে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিবার সময় গড়ের মাঠে একটি ভক্তের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ভক্তটি তাঁহাকে কলিকাতার বিখ্যাত উদ্যান ইডেন গার্ডেন দেখাইতে লইয়া যান। বাগান দেখিয়া নাগ-মহাশয় বালকের ন্যায় আনন্দ করিতে করিতে 'এটা কি, ওটা কি'

জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। পরে বাটী ফিরিবার সময় বলিয়াছিলেন, "মানুষ কেবল ভোগের জন্যই ব্যস্ত হইয়া ছুটিতেছে। কোথায় এই দেহ ধারণ করিয়া জন্ম-মৃত্যুর রহস্য বুঝিতে চেষ্টা করিবে, না কেবল আপাতমধুর কতকগুলি বিষয়ে সকলে আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে। এ হুঁশ নাই যে এখান হইতে শীঘ্রই চলিয়া যাইতে হইবে। এ সংসারে কেবল রাজসিক ও তামসিক ব্যাপার, কেবল ছুটাছুটি, কেবল 'কামিনীকাঞ্চনের' রাজত্ব! হা ঠাকুর, হা ঠাকুর, তোমার কি বিচিত্র লীলা!"

ইহার পর নাগমহাশয় একদিন গিরিশবাবুর বাটী গমন করেন। ঠাকুরের প্রসঙ্গ হইতে হইতে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "মশায়, ঠাকুর বলতেন, 'নিজেকে দীনহীন মনে করলে মানুষ দীনহীনই হয়ে যায়।' আপনি দিনরাত অমন করে আপনাকে দীনহীন মনে করেন কেন?" নাগমহাশয় বলিলেন, "নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছি আমি অতি হীন, অতি অধম, কি করে আমি নিজেকে শিব মনে করব? আপনি ও কথা বলতে পারেন, এই গিরিশবাবু ও কথা বলতে পারেন, আপনারা ঠাকুরের ভক্ত; আমার ঐরূপ ভক্তি হইল কই? আপনাদের কৃপা হলে, ঠাকুরের কৃপা হলে, আমি ধন্য হয়ে যাব।" কথাগুলি নাগমহাশয় এমন দীনহীনভাবে বলিলেন যে, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ আর কোনরূপ তর্ক-যুক্তি প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না। গিরিশবাবু এই ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলেন, "ঠিক ঠিক দীনতা হলে, ঠিক ঠিক অহংবুদ্ধির উচ্ছেদ সাধিত হলে, মানুষের নাগমহাশয়ের মত অবস্থা হয়। এই সকল মহাপুরুষের পাদস্পর্শে পৃথিবী পবিত্রা হন।"

সেই দিন বাসায় বসিয়া কয়েকটি ভদ্রলোকের সমক্ষে নাগমহাশয় আপনাকে 'পাপের ঢিপি—কীটের কীট' বলিতেছিলেন। বলিতে বলিতে স্বামী নিরঞ্জনানন্দের কথা মনে পড়িল, বলিলেন, "আজই গিরিশবাবুর বাড়ী শুনিয়া আসিলাম যে, 'কীট কীট' বলিলে কীট হইতে হয়, 'শিব শিব' বলিলে শিবপ্রাপ্তি হয়। তা আমি এক্ষণে কি করি!" একটু ভাবিয়া পরে বলিলেন, "তা সত্য কথায় দোষ নাই। আমি বাস্তবিকই কীট, কীটকে কীট বলিলে দোষ হইবে না। সত্য কথায় দোষ নাই। তবে ঠাকুরের কৃপা হইলে, আপনাদের কৃপা হইলে, গিরিশবাবুর কৃপা হইলে, সত্য কথায় কখন অসত্য পথে যাইব না।" এই বলিয়া সকলকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। ঠাকুরের উদ্দেশে, গিরিশের উদ্দেশে, বারবার নমস্কার করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন, "এই হাড়মাঁসের খাঁচা লইয়া কেমন করিয়া অভিমান করি যে, আমি শিব?" গিরিশবাবু মহাবীর, সাক্ষাৎ ভৈরব, তিনি বাস্তবিকই শিব।" এই বলিয়া আবার গিরিশবাবুর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন। তারপর উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের জন্য তামাক সাজিতে বসিয়া বলিলেন, "আমি আর কি করিব, আমি আপনাদের তামাক সাজিয়া খাওয়াই।"

নাগমহাশয় দেশে ফিরিয়া যাইবার পূর্বে রামকৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীনবগোপাল ঘোষের বাড়ী একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-উৎসব হয়। 'বসুমতী'পত্রিকার স্বত্বাধিকারী শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যাইবার জন্য নাগমহাশয়কে অনুরোধ করিলেন, আমিও তাহাতে যোগদান করিলাম। উৎসবের দিন প্রাতে আমায় সঙ্গে করিয়া নাগমহাশয়

আহিরীটোলায় উপেন বাবুর বাটি উপস্থিত হইলেন। বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া একখানি গাড়ী ভাড়া করা হইল। নাগমহাশয় বলিলেন, "আমি হেঁটে হেঁটে যাব, আপনারা গাড়ীতে যান।" উপেনবাবু জানিতেন, ঘোড়াকে চাবুক মারিলে নাগমহাশয় কাতর হইতেন। গাড়োয়ানকেও তিনি একথা বিশেষ করিয়া বলিয়া দিলেন। তারপর অনেক অনুরোধ করিয়া নাগমহাশয়কে গাড়ীতে উঠান হইল। গাড়ী নবগোপালবাবুর বাড়ী পৌঁছিলে নবগোপাল-বাবু নাগমহাশয়কে দেখিয়া 'জয় রাম, জয় রাম' ধ্বনি করিতে লাগিলেন; নাগমহাশয় তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। বাটির ভিতর প্রবেশ করিয়া নাগমহাশয় বৈঠকখানার এক কোণে দাঁড়াইয়া নিমন্ত্রিত ভক্তগণকে বাতাস করিতে লাগিলেন। নবগোপালবাবু ও অন্যান্য ভদ্রলোকসকল নিষেধ করিয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। অবিরাম 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে রামকৃষ্ণপুর প্রতিধ্বনিত হইতেছে; উৎসবের উল্লাসে, সংকীর্ত্তনের উচ্ছ্বাসে ভক্তগণ বিভোর হইয়া আছেন, কিন্তু নাগমহাশয়ের সেদিন আর অপর কার্য্য নাই; যেন সেবা করিতে তাঁহার জন্ম স্থির অবিচলিতভাবে দাঁড়াইয়া কেবল বাতাসই করিতেছেন। তারপর ভক্তেরা প্রসাদ পাইতে বসিলে তিনি তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সকলের বিস্তর অনুরোধে তিনি প্রসাদের কণামাত্র গ্রহণ করিলেন, খাইতে বসিলেন না। সকলে অবাক হইয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন।

কলিকাতায় ফিরিবার সময় অনেক অনুরোধ করিয়াও আর তাঁহাকে গাড়ীতে চড়ান গেল না। কাজেই আমরা পদব্রজে

পুনর্যাত্রা করিলাম। আসিতে আসিতে নাগমহাশয় বলিলেন, "নবগোপালবাবুর পরিবারকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিদ্যাপ্রকৃতির অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া বলিতেন। তাঁহার হাতে ঠাকুর নিজে খাইয়াছেন। এঁদের যে মানুষ জ্ঞান করে তার পশুজ্ঞান।"

কিছুদিন পরে নাগমহাশয় দেশে চলিয়া গেলেন। কলিকাতায় এই তাঁহার শেষ আসা।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনের পর নাগমহাশয় যখন প্রথম দেশে আসিয়া বাস করেন তখন ভাবিয়াছিলেন, একখানি কুটির বাঁধিয়া নির্জনে বাস করিবেন। মাতাঠাকুরাণী তাঁহার মনোভাব অবগত হইয়া বলেন, "আমি কোন দিন কোন বিষয়ের জন্য আপনাকে বিরক্ত করি নাই, কখন করিবও না, তবে পৃথক বাসের কি প্রয়োজন? সাধ্বী সহধর্মিণীর আশ্বাসে আশ্বস্ত হইয়া নাগমহাশয় সংসারে বাস করিতে লাগিলেন; কিন্তু গৃহে থাকিয়াও তিনি আজীবন সন্ন্যাসীর ধর্ম পালন করিয়া গিয়াছেন। মাতা-ঠাকুরাণী বলেন, "তাঁহার (নাগমহাশয়ের) শরীরে কি মনে কোনরূপ মানবীয় বিকার বা পরিবর্তন কখন লক্ষিত হয় নাই; 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া তিনি জৈব ভাবের মস্তকে পদাঘাত করিতে করিতে চলিয়া গিয়াছেন। তিনি অগ্নিমধ্যে বাস করিয়াছেন বটে, কিন্তু দিনেকের তরেও তাঁর শরীর দগ্ধ হয় নাই!"

নাগমহাশয় তাঁহার প্রধান ভক্ত হরপ্রসন্নকে কোন সময় বলিয়াছিলেন, "দেখ, পশুপক্ষীর যোনি পর্য্যন্ত আমি আজন্ম মাতৃযোনির ন্যায় দেখিয়াছি "

নাগমহাশয়ের গুরুকুলের দুইজন জ্ঞাতি একবার দেওভোগে

তাঁহাকে দর্শন করিতে আসেন। এই দুই জনের মধ্যে একজন সাধক ছিলেন; নাম নবীনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। দীনদয়ালের বিশেষ অনুরোধে সাধক গৃহস্থের ধর্ম অবলম্বন করিয়া সন্তান উৎপাদন করিবার জন্য নাগমহাশয়কে অনুরোধ করেন। অনুরোধ কর্ণগোচর হইবামাত্র নাগমহাশয় মূর্চ্ছিতের ন্যায় পড়িয়া গেলেন; শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। "গুরুকুলের সাধক হইয়া আপনি এই অসঙ্গত আদেশ করিতেছেন?"—বলিয়া তিনি নিকটে পতিত একখণ্ড ইষ্টক দ্বারা আপনার মস্তকে আঘাত করিতে লাগিলেন। কপাল কাটিয়া ঝর ঝর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। সাধক তখন অনুতপ্ত হইয়া আদেশ প্রত্যাহার করেন। নাগমহাশয় সুস্থ হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র নাগ বলেন, শ্রীযুত দীনদয়াল একদিন নাগমহাশয়কে ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেছেন, "তোর খাওয়া পরা চলিবে কিরূপে?" নাগমহাশয় উত্তর দিয়াছিলেন, "বাবা, আমার খাওয়া-পরার জন্য চিন্তা কি? বৃক্ষে প্রচুর পত্র রহিয়াছে। আর আমি জীবনে কোনদিন স্ত্রীলোক স্পর্শ করি নাই; মাতৃগর্ভ হইতে যেমন পড়িয়াছিলাম এখনও সেইরূপ আছি, বস্ত্র পরিবার আমার আবশ্যক কি?"

একমাত্র পুত্রের সংসারবৈরাগ্য দেখিয়া শ্রীযুত দীনদয়াল মধ্যে মধ্যে নাগমহাশয়কে ভর্ৎসনা করিতেন। একদিন কথায় কথায় পিতাপুত্রে কথান্তর হইলে নাগমহাশয় উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "আমি জীবনে কখন স্ত্রীসঙ্গ করি নাই; আমার সংসারে কোন প্রয়োজন নাই।" তারপর 'নাহং নাহং' বলিতে বলিতে বস্ত্র

পরিত্যাগ করিয়া বাটি হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মাতাঠাকুরাণী কান্নাকাটি করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ব্যাকুল দেখিয়া নাগ-মহাশয়ের একজন ভক্ত শ্রীযুত অন্নদা তাঁহাকে কিছুদূর হইতে গৃহে ফিরাইয়া আনেন।

দেওভোগবাসিনী কোন এক প্রৌঢ়া বিধবা নাগমহাশয়কে সর্বদা দর্শন করিতে আসিতেন ও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন। কিন্তু নাগমহাশয়ের তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টিতে প্রৌঢ়ার গূঢ় দুরভিসন্ধি গুপ্ত রহিল না। প্রৌঢ় বয়সে বিধবার তদ্রূপ দুর্মতি দেখিয়া নাগমহাশয় মনে মনে তাহাকে অবজ্ঞা করিতেন। মাতাঠাকুরাণী বিধবার মনোভাব অবগত হইয়া তাহার আসা বন্ধ করিয়াছিলেন। নাগমহাশয় বলিতেন, "হায় হায়, কাক কুকুরেরও বোধ হয় এই ছাই হাড়মাঁসের খাঁচার মাংস খাইতে রুচি হয় না; কিন্তু ইহাতে ওর কেন এমন ভাব হইল! ঠাকুর কতরূপেই না আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন! জয় রামকৃষ্ণ! জয় রামকৃষ্ণ!" তারপর বলিলেন, "মানবজীবনে জিহ্বা ও উপস্থ এ দুটি জয় করা বড় কঠিন ব্যাপার; ঠাকুরের কৃপা হইলে তাহাদিগকে বশে আনয়ন করিতে পারা যায়।" তাঁহার মুখে সময় সময় অতি ছোট কথায় অতি মহৎ সত্যতত্ত্ব প্রচারিত হইত। তিনি প্রায় বলিতেন, "কাম ছাড়লেই রাম, রতি ছাড়লেই সতী।"

যেমন কামিনীতে, অর্থেও তেমনি তিনি হতাদর ছিলেন। একবার নারায়ণগঞ্জের পালমহাশয়দিগের কোন বিশেষ আত্মীয়ের বসন্ত হয়। কোন চিকিৎসায় কিছু ফল হইল না। নাগমহাশয়ের চিকিৎসার খ্যাতি পালবাবুদের জানা ছিল। তাঁহারা নাগমহাশয়ের

শরণাপন্ন হইলেন। নাগমহাশয়ও কিছুতেই এড়াইতে পারিলেন না। রোগী দেখিয়া হোমিওপ্যাথি মতে একটি ঔষধ নির্বাচন করিয়া দিলেন। পালবাবুরা সেই ঔষধ আনিয়া খাওয়াইলে রোগ সারিয়া গেল। পালবাবুদের কর্তা দেওভোগে আসিয়া নাগমহাশয়কে তিনশত টাকা পারিতোষিক স্বরূপ প্রদান করিলেন, কিন্তু নাগমহাশয় তাহা স্পর্শ করিলেন না। অবশেষে পালকর্তা যখন বিশেষ পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, নাগমহাশয় তখন কাতর হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়া উঠিলেন, "হায় ঠাকুর, কেন আমায় চিকিৎসারূপ হীনবৃত্তি শিখাইয়াছিলে, তাতেই ত আমার এই দুঃখভোগ করিতে হইতেছে!" তাঁহার কাতর ক্রন্দন শুনিয়া পালকর্তা বলিয়াছিলেন, "বাবা, তুমি কখন মানুষ নও!"

এই অলৌকিক গৃহস্থের সকল আচরণই অলৌকিক ছিল। একবার পালবাবুদের অনুরোধে তিনি ভোজেশ্বরে আসিয়াছিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবার সময় বাবুরা তাঁহাকে ষ্টিমারভাড়া নগদ আট টাকা ও একখানি কম্বল কিনিয়া দেন। ভোজেশ্বর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ দূরে হাঁসেরকাদিতে তখন ষ্টিমারষ্টেসন ছিল। সেখানে পৌছিয়া নাগমহাশয় টিকিট কিনিতে যাইতেছেন, এমন সময় তিন চারিটি শিশুসন্তান লইয়া এক ভিখারিণী অতি কাতরকণ্ঠে তাহাদের কষ্ট জানাইয়া তাঁহার কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করিল। তাহাদের কাতরোক্তি শুনিয়া নাগমহাশয় কাঁদিয়া ফেলিলেন; পালবাবুদের প্রদত্ত আটটি টাকা ও কম্বলখানি ভিখারিণীকে দিয়া বলিলেন, "মা, তুমি এই লইয়া শিশুসন্তান কয়টিকে ও আপনাকে রক্ষা কর।" দুই হাত তুলিয়া আশীর্বাদ

করিতে করিতে ভিখারিণী চলিয়া গেল। অনেক পথ হাটিয়া আসিয়াছেন, নাগমহাশয় ষ্টেশনে বসিয়া একটু বিশ্রাম করিলেন; তারপর ষ্টিমার ছাড়িয়া দিলে তিনি কলিকাতা অভিমুখে চলিতে আরম্ভ করিলেন। পথে দেবালয় পাইলে প্রসাদ খাইতেন, নহিলে মুড়ি। নদীনালা বিস্তীর্ণ হইলে খেয়ার পয়সা দিয়া পার হইতেন, সংকীর্ণ হইলে সাঁতারে। তাঁহার সঙ্গে সাড়ে সাত আনা মাত্র পয়সা ছিল। তাহার উপর নির্ভর করিয়া উনত্রিশ দিন ক্রমান্বয়ে হাঁটিয়া তিনি কলিকাতায় আসেন।

একবার অনেকদিন কুত্তের কার্য্য বন্ধ থাকায় নাগমহাশয়ের ভয়ানক অর্থকষ্ট হইয়াছিল, এমন কি সময়ে সময়ে তাঁহাকে উপবাসী থাকিতে হইত। অনেক দিনের পর একদিন পাল-বাবুদের দুই হাজার মণ নুন চালান হইল। কুত্ত করিবার জন্য তিনি খিদিরপুরে গেলেন। দুই হাজার মণের চালানে তাঁর পাওয়া উচিত ছিল সাত আট টাকা, কিন্তু সমস্ত দিন রৌদ্রে পুড়িয়া সেদিন মোট তের আনা উপার্জন হইল। পথে আসিতে আসিতে গড়ের মাঠে একব্যক্তি তাঁহাকে দুঃখ জ্ঞাপন করিলে নাগমহাশয় সমস্ত দিনের উপার্জন সেই তের আনা তাহাকে-দিয়া রিক্তহস্তে বাসায় ফিরিয়া আসিলেন। বাসায় সে সময় তণ্ডুলাভাব।

নাগমহাশয় যখন শিশু ছিলেন, শুনিয়াছি কুকুর কি বিড়াল ডাকিলে, তাঁহার মনে হইত তাহারা ক্ষুধায় কাতর হইয়া কাঁদিতেছে। ব্যাকুল হইয়া পিসীমাকে বলিতেন, "আহা মা! ওরা কাঁদছে কেন? ওদের কিছু খেতে দাও না!" তখন

কখন আপনি তাহাদিগকে আদরে আহার দিয়া বলিতেন, "আর কেঁদ না, ভাই! এই যে আমি খেতে দিচ্ছি।"

তাঁহার বাটীর সংলগ্ন একটি ছোট পুষ্করিণী ছিল। যখন তাঁহার তের কি চৌদ্দ বৎসর বয়স, তিনি আহারান্তে নিত্য ঐ পুষ্করিণীতে আঁচাইতে যাইতেন এবং যাইবার সময় হাতে করিয়া চারিটি ডালভাত লইয়া যাইতেন। পুষ্করিণীর কতকগুলি মাছ তাঁহার পোষা ছিল। নাগমহাশয় ডাকিবামাত্র তাহারা আসিত এবং তাঁহার হাত হইতে ঐ ডালভাত খাইত। তিনি মাছগুলিকে হাতে ধরিয়া আদর করিতেন! কলিকাতায় পড়িতে আসিবার পূর্ব্বাবধি তিনি মাছগুলিকে লইয়া এইরূপ খেলা করিতেন। নাগমহাশয় বলিতেন, "ইতরসাধারণ জীবেও জ্ঞানের অল্পাধিক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। জন্মান্তরে তাহারাও ক্রমে উচ্চগতি লাভ করিয়া অবশেষে মুক্ত হইয়া যাইবে।"

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র নাগ বলেন, "আমি কোন সময় নাগমহাশয়ের কাছে সর্বদা যাতায়াত করিতাম। একদিন গ্রীষ্মকালে সকালে গিয়া দেখি তিনি মণ্ডপে বসিয়া তামাক খাইতেছেন। আমি উঠানে দাঁড়াইয়া কথা কহিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে দুটি বন্য শালিখ উড়িয়া আসিয়া নাগমহাশয়ের কাছে বসিল। তিনি একমনে তামাক খাইতেছিলেন, পাখী দুটিকে দেখিতে পান নাই। ক্রমে তাহারা তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিবার জন্য পায়ে ঠোকরাইতে লাগিল। তখন তিনি সস্নেহে তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'এসেছ মা! বোস, আমি তোমাদের খাবার দিচ্ছি।' তারপর একমুষ্টি তণ্ডুল আনিয়া তাহাদের হাতে করিয়া খাওয়াইতে

লাগিলেন। কিন্তু ঐ মুষ্টিমেয় তণ্ডুলে তাহাদের তৃপ্তি হইল না। তাহারা নাগমহাশয়ের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। তখন নাগ-মহাশয় একটি বাটিতে আরও কিছু চাল ও আর একটি বাটিতে জল আনিয়া হাতে করিয়া ধরিলেন। পাখী দুটি তাঁহার হাতের উপর বসিয়া খাইতে লাগিল। তাহাদের তৃপ্তি হইলে নাগমহাশয় পুনরায় তাহাদের গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, 'এস মা এখন! বনে গিয়ে খেলা কর, কাল আবার এস।' পাখী দুটি উড়িয়া গেল। নাগমহাশয় বলিলেন, 'শ্রীরামকৃষ্ণ কত খেলাই না করিতেছেন!"

গিরিশবাবু বলেন, "অহিংসা পরম ধর্ম—ইহার জলন্ত দৃষ্টান্ত নাগমহাশয়ই হইতে পারেন।" নারায়ণগঞ্জের পাটের কলের সাহেবরা দেওভোগে কখন কখন পাখী শিকার করিতে আসিতেন। একবার বন্দুকের শব্দ পাইয়া নাগমহাশয় ছুটিয়া সাহেবদের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নিষ্ঠুর কার্য হইতে নিরস্ত হইবার জন্য করজোড়ে তাহাদিগকে বিস্তর মিনতি করিলেন। সাহেবরা তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিয়া পাখী মারিবার জন্য পুনরায় বন্দুক তৈয়ার করিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় তখন তর্জন গর্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "আর এমন অন্যায় কর্ম করিবেন না।" সাহেবরা ভাবিলেন—নিশ্চয় একটা পাগল। পাগলের কথায় কে ভ্রূক্ষেপ করে? শিকার লক্ষ্য করিয়া সাহেবরা আবার যেমন বন্দুক তুলিলেন, অমনি পলকের মধ্যে নাগমহাশয় বন্দুক ধরিয়া ফেলিলেন। সেই ক্ষীণকলেবরে কোথা হইতে শত সিংহের বল জাগিয়া উঠিল! সাহেবরা বিস্তর চেষ্টা করিয়াও বন্দুক ছাড়াইতে

পারিলেন না। নাগমহাশয় বন্দুক কাড়িয়া লইয়া চলিয়া আসিলেন এবং প্রাণসংহারক অস্ত্র স্পর্শ করিয়াছেন বলিয়া গৃহে আসিয়া বন্দুক রাখিয়া হাত ধুইয়া ফেলিলেন। এদিকে সাহেবরাও নারায়ণগঞ্জে ফিরিয়া আসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন—নালিশ করিবেন। ইতোমধ্যে পাটের কলের একটি কর্মচারীর দ্বারা নাগমহাশয় সাহেবদের বন্দুক দুইটি ফিরাইয়া পাঠাইয়া দিলেন। কর্মচারীর মুখে নাগমহাশয়ের সাধু চরিত্রের কথা শুনিয়া সাহেবদের মনে বিশেষ শ্রদ্ধার উদয় হইল। সেই অবধি তাঁহারা আর দেওভোগে শিকার করিতে আসিতেন না।

নিরীহ প্রাণীর যন্ত্রণা দেখিলে নাগমহাশয় অধীর হইয়া উঠিতেন। তাঁহার বাড়ীতে দক্ষিণ ধারে একটি ছোট ডোবা ছিল, বৎসর বৎসর বন্যায় ভাসিয়া আসিয়া তাহাতে বিস্তর মাছ জমা হইত। একদিন এক জেলে ঐ ডোবায় মাছ ধরিয়া প্রচলিত নিয়মানুসারে নাগমহাশয়কে ভাগ দিতে আসে। জীবন্ত মাছগুলি তখন ধড়ফড় করিতেছে দেখিয়া নাগমহাশয়ের দারুণ যন্ত্রণা হইতে লাগিল। জেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সমস্ত মাছগুলির কি দর? সে যে-দর বলিল, মাছগুলি সেই দরে কিনিয়া আবার ডোবায় ছাড়িয়া দিলেন।

আর একদিন আর একজন জেলে তাঁহার বাড়ীর সন্নিকটস্থ পুকুরের মাছ ধরিয়া নাগমহাশয়ের বাড়ীতে বেচিতে আসে। কই, মাগুর, সিঙ্গি প্রভৃতি মাছগুলি চুপড়িতে ছট্‌ফট্‌ করিয়া লাফাইতেছে। নাগমহাশয় সমস্ত মাছগুলি কিনিলেন এবং অবিলম্বে পুকুরে ছাড়িয়া দিলেন। জেলের চক্ষু স্থির! মাছের

দাম ও চুপড়ি ফিরিয়া পাইবামাত্র সে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল! আর কখন সে নাগমহাশয়ের বাড়ীর ত্রিসীমানা মাড়ায় নাই।

নাগমহাশয়ের বাড়ীতে প্রতি বৎসর পূজা হইত, কখন পশুবলি হয় নাই। খল সর্পকেও তিনি কখন হিংসা করিতেন না। একবার একটি গোখুরা সাপ তাঁহার গৃহপ্রাঙ্গণে দেখা দেয়। বাটীর সকলে ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। মাতাঠাকুরাণী বলিলেন, "সাপটা মারিলে হয় না?" নাগমহাশয় বলিলেন, "বনের সাপে খায় না, মনের সাপে খায়।" তারপর সাপটিকে করজোড়ে বলিলেন, "আপনি মা মনসা দেবী! জঙ্গলে থাকেন, দরিদ্রের কুটির ছাড়িয়া স্বস্থানে গমন করুন।" এই বলিয়া তুড়ি দিতে দিতে তিনি পথ দেখাইয়া চলিতে লাগিলেন, সাপও নতশিরে তাঁহার অনুগমন করিয়া জঙ্গলে প্রবেশ করিল। এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি বলিতেন, "অনিষ্ট না করিলে জগতে কেহ কাহারও অনিষ্ট সাধন করে না, যে যেমন করে জগৎ তার প্রতি ঠিক তদনুরূপ ব্যবহার করে। যেমন আরশিতে নিজের প্রতিবিম্ব দেখা; যেমন অঙ্গভঙ্গী করা যায়, প্রতিবিম্বের তদনুরূপ অঙ্গভঙ্গী দৃষ্ট হয়।"

শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ যখন বরাহনগরে তখন একদিন সেখানে একটি সাপের সলুই দৃষ্ট হয়। গিরিশ বলেন, "সর্পশিশু দেখিয়াই ত সকলে তাহাকে মারিবার জন্য উদ্যত। ইতোমধ্যে নাগমহাশয় আসিয়া 'নাগরাজ, নাগরাজ' বলিয়া তাহাকে আদর করিতে করিতে নিরাপদ স্থানে ছাড়িয়া দিয়া আসিলেন।" তিনি বলিলেন, "আমরা বুদ্ধির দোষে দোষ করিয়া নিজেরাই কষ্ট পাই; এই বুদ্ধি

ঈশ্বরপাদপদ্মে যখন নিশ্চল হইয়া অবস্থান করে তখন আর কোন বিষয় মন্দ বলিয়া বোধ হয় না।"

একবার তাঁহার সর্পদংশন হয়; তিনি পুকুরঘাটে পা ডুবাইয়া মুখ ধুইতেছিলেন, সাপ তখন তাঁহার বামপদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটি কামড়াইয়া ধরে। নাগমহাশয় জানিতে পারিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। অল্পক্ষণ পরেই সাপটা পা ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল। মাতাঠাকুরাণী শুনিয়া যারপর নাই উদ্বিগ্ন হইলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, "ও কিছু নয়, আহার মনে করে জোলো সাপে কামড়ে ধরেছিল। তারপর ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে।"

তিনি বলিতেন, "জীবে জীবে এক এ ভগবানই বিরাজ করিতেছেন।" 'সর্বদা জোড়হাত করিয়া থাকেন কেন?'—জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, "ভূতে ভূতে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাই।" গাছের একটি পাতা ছিঁড়িতেও তিনি হৃদয়ে বজ্রবেদনা অনুভব করিতেন। তাঁহার রন্ধনঘরের পিছনে একটি আমগাছ ছিল, একটি ভক্তকে তাহার একটি পত্র ছিন্ন করিতে দেখিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আহা, এদেরও ত সুখ-দুঃখবোধ আছে!"

তাঁহার বাড়ীর পূর্বদিকের ঘরের পিছনে একঝাড় বাঁশ ছিল। কখন কখন তাহার কঞ্চিগুলি ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিত। তিনি কিছুতেই কাটিয়া দিতেন না। বলিতেন, "যাহা গড়িবার সাধ্য নাই, তাহা ভাঙ্গা উচিত কি?"

তাঁহাকে কখন একটি মশা মারিতে দেখি নাই। কতবার দেখিয়াছি, ছারপোকাগুলিকে অতি যত্নে তিনি আপনার বিছানায় স্থান দিতেছেন। পিপীলিকা গায়ে উঠিলে অতি সাবধানে ধরিয়া

তিনি নিরাপদ স্থানে ছাড়িয়া দিতেন। কখন কখন তাঁহার মনের গতি এমন হইত যে, পাছে পায়ের চাপে ক্ষুদ্র পোকা মাকড় মারা পড়ে, এই ভয়ে তিনি পথ চলিতে পারিতেন না। শ্বাস-প্রশ্বাসে পাছে অদৃশ্য বায়বীয় কীটসকল বিনষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় কখন কখন তাঁহার নিশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হইয়া যাইত।

একদিন কোন ভক্ত নাগমহাশয়ের বাটীর পূজামণ্ডপে বসিয়া দেখেন যে, পূর্বদিকের বাঁশের বেড়াতে উই ধরিয়াছে। দেখিবামাত্র ভক্তটি উঠিয়া সেই বেড়াতে সজোরে আঘাত করিতে লাগিলেন। অনেকখানি বাসা ভাঙ্গিয়া গেল এবং অনেকগুলি উই নিরাশ্রয় হইয়া মাটিতে পড়িল। নাগমহাশয় ঐ মণ্ডপের বারান্দায় বসিয়াছিলেন। তিনি কাতরস্বরে বলিলেন, "হায় হায়, কি করলেন! ইহারা এতকাল এই বেড়া উপলক্ষ্য করিয়া ঘর দুয়ার তৈয়ার করিয়া বসবাস করিতেছিল, আজ আপনি ইহাদের আশ্রয় নষ্ট করিয়া বড় অন্যায় করিলেন।" ইহা বলিতে বলিতে নাগমহাশয়ের চক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। ভক্তটি দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। নাগমহাশয় শেষে ঐ নিরাশ্রয় কীটগুলির সম্মুখস্থ হইয়া বলিলেন, "আপনারা আবার বাসা তৈয়ার করুন, আর ভয় নাই।" তাহারা আবার যথাকালে সেই বেড়াতে বল্মীক প্রস্তুত করিল এবং কালে ঐ বেড়া খসিয়া পড়িল। নাগমহাশয় তথাপি কাহাকেও তাহা ছুঁইতে দিতেন না।

সুরেশ বলেন, "নাগমহাশয় চিরদিনই গাভীকে ভক্তি করিতেন। তিনি শাস্ত্রের বিধি-বিধান অনুসারে কখন গোদান বা গোপূজা করিয়াছিলেন কিনা, তাহা আমার জানা নাই। কিন্তু অতি

বাল্যকাল হইতেই তিনি গাভী দেখিলে নমস্কার করিতেন এবং কখন কখন গাভীদিগের পদধূলি লইতে আমি তাঁহাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছি। একবার তিনি একগাছি আক আনিয়াছিলেন। একটি গাভী আসিয়া তাহার পাতাগুলি খাইবার চেষ্টা করে। নাগমহাশয় তাহা জানিতে পারিয়া পরম যত্নের সহিত সেই গাভীকে তাহা ভক্ষণ করাইয়াছিলেন। অবশেষে ভগবতীজ্ঞানে তাহাকে প্রণাম করেন। ইক্ষুদণ্ডকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ঐ গাভীর গাত্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে তাহাকে ভক্ষণ করিতে বার বার অনুরোধ ও উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। পরে পাখার দ্বারা তাহাকে বীজন করিতে করিতে নির্বাক হইয়া মূর্চ্ছিতের ন্যায় মাটিতে পড়িয়া গেলেন।"

নাগমহাশয় শক্তি-উপাসক ছিলেন; কিন্তু তিনি বলিতেন, "পথে মতে কিছু আসে না। যে কোন মতে একনিষ্ঠ হইলে ভগবান তাহাকে পথ দেখাইয়া দেন।" তাঁহার ভেদবুদ্ধি ছিল না; শৈব, বৈষ্ণব, বাউল, কর্তাভজা প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের সাধককেই তিনি সমাদর করিতেন। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান ভেদ তাঁহার ছিল না। মসজিদ বা পীরের স্থান দেখিলে তিনি নতশিরে সেলাম দিতেন। গির্জা দেখিলে 'জয় যীশু' বলিয়া অভিবাদন করিতেন।

সাধনাসম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "গাছের তলায় জাগিয়া বসিয়া থাকার ন্যায় সাধনা দ্বারা আপনাকে জাগরিত করিয়া রাখিতে হয়, কিন্তু ফল তাঁর হাতে; তিনি দয়া করিয়া ফল দিলে তবে জীব সে সকলের অধিকারী হয়, নতুবা নহে। কেহ বা ঘুমাইয়া আছে, ভগবান দয়া করিয়া হয় ত তাহার মুখে ফল ফেলিয়া দিলেন,

তাহাকে আর কোন্ কিছু সাধনভজন করিতে হয় না। ইহারাই কৃপাসিদ্ধ হন। যতদিন না তিনি কৃপা করেন, ততদিন কেহই তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হয় না। তিনি কল্পতরু, যে যাহা চায় ভগবান নিশ্চয় তাহাকে তাহা দান করেন; কিন্তু যাহাতে জীবকে পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর পথে যাইতে হয়, এমন বাসনা করা জীবের কদাপি উচিত নহে। ভগবানের পাদপদ্মে কেবল শুদ্ধা ভক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞানের জন্য প্রার্থনা করা উচিত। তবেই জীব সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া ভগবৎকৃপায় মুক্ত হইয়া যাইতে পারে। সংসারের যে কোন বিষয়ে বাসনা করা যায় তাহা হইতে জীবের জ্বালাযন্ত্রণা আসিবেই। কিন্তু যিনি ভগবান, ভক্ত ও ভাগবত-প্রসঙ্গে দিন যাপন করেন, তাঁহার ত্রিতাপ-জ্বালা অন্তে দূর হইয়া যায়।”

সিদ্ধি-সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, “যথার্থ সাধুভাবাপন্ন হইলে শক্তি, সিদ্ধি, ঋদ্ধি সাধককে সর্বদা প্রলোভিত করে। যথার্থ সাধুর হৃদয়ে জগতের যাবতীয় বস্তুর প্রতিবিম্ব পড়ে, তাঁহাকে ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু দেখিতে বা বলিতে হয় না; যেমন সাদা স্ফটিক পাথরে সকল জিনিষের প্রতিবিম্ব পড়ে, তদ্রূপ। কিন্তু এই সকল লক্ষ্য হইলে উহারা তাঁহাকে আদর্শজীবন-লাভ হইতে বিপথগামী করে।”

কাহারও মনে কোন সন্দেহ উঠিলে তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে হইত না, তিনি আপনা হইতে কথা তুলিয়া মীমাংসা করিয়া দিতেন। কে কেমন আধার, কাহার কি মনের ভাব, তিনি মুখ দেখিয়া বুঝিতে পারিতেন। কত লোকের সম্বন্ধে তাঁহার কত কথা অবিকল সত্যে পরিণত হইয়াছে। কেহ দেওভোগে আসিবার পূর্বে তিনি

মাতাঠাকুরাণীকে বলিতেন, "আজ অমুক লোক আসিতেছেন, আমাকে এখনি বাজারে যাইতে হইবে।" যাঁহাকে স্মরণ করিতেন, তিনিই তাঁহার সকাশে উপস্থিত হইতেন।"

আমার আত্মীয় শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার চক্রবর্তী একবার আমার সঙ্গে নাগমহাশয়কে দেখিতে যান। অশ্বিনীর শূল-বেদনা ছিল, প্রতিদিন সন্ধ্যা হইতে সকাল পর্যন্ত তাঁহাকে এক প্রকার মৃতবৎ হইয়া পড়িয়া থাকিতে হইত। দেওভোগের পথে সন্ধ্যা হইতে আমার ভয় হইয়াছিল, আমি কেবলই ভাবিতেছিলাম কখন তাঁহার বেদনা ধরে, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় পথটা নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। অশ্বিনীবাবু আমায় আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, "বেদনা ধরিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।" পাঁচ মাস রাত্রে জলগ্রহণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু সে রাত্রে অশ্বিনী প্রচুর আহার করিয়া শয়ন করিলেন। আমরা তিন দিন দেওভোগে ছিলাম, তিনদিনই নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল। অশ্বিনী বলেন, "অমন মহাপুরুষের হাওয়া লাগিয়া আমার জন্মান্তরীণ পাপের ফল—এমন উৎকট ব্যাধি দূরীভূত হইয়াছিল। তখন হইতে তাঁহাকে ধরিয়া থাকিলে আমার নরজন্ম সার্থক হইয়া যাইত।"

একবার দেওভোগের একটি ব্রাহ্মণ বালকের বিসূচিকা হয়। তাহার বিধবা জননী মুমূর্ষু অবস্থায় তাহাকে নাগমহাশয়ের বাটীতে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যান। ঈশ্বরেচ্ছায় বালকটি আরোগ্যলাভ করে। সুরেশ এই আরোগ্য-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে নাগমহাশয় বলিয়াছিলেন, "বালকটি সারিয়াছিল বটে, কিন্তু সে সম্বন্ধে আমার কিছু বলিবার নাই।"

একবার চৈত্রমাসে নাগমহাশয়ের বাড়ীর উত্তর ধারে চৌধুরী-দিগের বাড়ীতে আগুন লাগে। অনিলসহায়ে অনল দেখিতে দেখিতে প্রবল হইয়া উঠিল। চৌধুরীবাড়ী হইতে নাগমহাশয়ের বাড়ী পঁচিশ ত্রিশ হাত অন্তরে। তাঁহার চালে আগুনের ফিনকি আসিয়া পড়িতে লাগিল। আগুন নিবাইবার জন্য পাড়ার সকলের চেষ্টা, চারিদিকে গণ্ডগোল; কেবল নাগমহাশয় একা অবিচলিত ভাবে অগ্নির সম্মুখে জোড়করে দণ্ডায়মান। মাতাঠাকুরাণী ভীতা হইয়া ঘরের কাপড় কাঁথা লেপ বালিশ বাহির করিতে লাগিলেন।

নাগমহাশয় বলিলেন, "এখনও এমন অবিশ্বাস! কী হবে ছাই এই কাঁথা কাপড় দিয়ে! ব্রহ্মা আজ বাড়ীর নিকটে উপস্থিত হইয়াছেন; কোথায় এখন তাঁর পূজা করবে, না সামান্য কাঁথা কাপড় নিয়ে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লে! জয় ঠাকুর! জয় ঠাকুর!" এই বলিয়া তিনি বাড়ীর উঠানে করতালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে!" চৌধুরীদিগের বাড়ী ভস্মসাৎ করিয়া অগ্নি তৃপ্ত হইলেন; নাগমহাশয়ের বাটীর এক গাছি তৃণও দগ্ধ হয় নাই।

যে বৎসর অর্ধোদয়যোগ হইয়াছিল, যোগের তিন-চারি দিন পূর্ব্বে নাগমহাশয় একবার দেশে যান। তাঁহাকে সেই সময় বাড়ী আসিতে দেখিয়া দীনদয়াল বলিলেন, "এই গঙ্গাস্নানযোগে কতলোক সর্বস্বান্ত হইয়া গঙ্গাতীরে গমন করিতেছেন, আর তুই সেই গঙ্গাতীর পরিত্যাগ করিয়া দেশে আসিলি! তোর ধর্ম-কর্মের মর্ম আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না! এখনও তিন-চারি দিন

সময় আছে, আমাকে একবার ভাগীরথীর তীরে লইয়া চল।” নাগমহাশয় বলিলেন, “যদি মানুষের যথার্থ অনুরাগ থাকে, মা ভাগীরথী গৃহে আসিয়াই দর্শন দেন, তাহাকে আর কোথাও যাইতে হয় না।” ক্রমে গঙ্গাস্নানের দিন আসিল। শ্রীমতী হরকামিনী, শ্রীযুত কৈলাস বসু প্রভৃতি নাগমহাশয়ের ভক্তগণ সেদিন দেওভোগে উপস্থিত ছিলেন। যোগের সময় শ্রীমতী হরকামিনী দেখিলেন, নাগমহাশয়ের বাটীর পূর্ব্বদিকের ঘরের অগ্নিকোণে প্রাঙ্গণ ভেদ করিয়া প্রবল বেগে জল উঠিতেছে! জল ক্রমে কলকল নাদে প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। নাগমহাশয় গৃহাভ্যন্তরে ছিলেন। লোকের কলরবে বাহিরে আসিয়া, “মা পতিতপাবনী! মা ভাগীরথী!” বলিয়া উৎসের সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইলেন; পরে সেই জল অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া মাথায় দিয়া আবার প্রণাম করিয়া সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। তাহার পর সকলে স্নান করিতে আরম্ভ করিলেন। সংবাদ পাইয়া ক্রমে পল্লীর লোক দলে দলে আসিয়া স্নান করিতে লাগিল। “জয় গঙ্গে! জয় গঙ্গে!” রবে নাগমহাশয়ের গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে জলের উচ্ছ্বাস কমিয়া গেল; ক্রমে ধীরে ধীরে প্রাঙ্গণের জল নামিয়া গেল। দেওভোগে এখনও এমন লোক জীবিত আছেন, যাঁহারা একবাক্যে এই ঘটনার সাক্ষ্য প্রদান করেন। শ্রীমতী হরকামিনীর বহুদিনের গুল্মরোগ এই জল স্পর্শ করিয়া সম্পূর্ণরূপে সারিয়া যায়। নাগমহাশয় জীবনে কখনও এই প্রসঙ্গের উল্লেখ করেন নাই। কেহ এই সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিতেন, “হায় হায়, লোকে

কাচকে কাঞ্চন করে!" স্বামী বিবেকানন্দ এই ঘটনা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "অমন মহাপুরুষের ইচ্ছায় ইহা কিছু অসম্ভব নহে। ইহাদের অমোঘ ইচ্ছাশক্তিতে জীব-উদ্ধার হইয়া যাইতে পারে।"

জীবনের সকল ঘটনায় তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মঙ্গলময় কর দেখিতে পাইতেন। একরাত্রে আমি তাঁহার বাটীতে শুইয়া আছি, একটা শব্দে আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল! নাগমহাশয়ের গলা শুনিতে পাইলাম। নাগমহাশয় রন্ধনঘরে শয়ন করিতেন, তাড়াতাড়ি সেখানে গিয়া শুনিলাম—একটা বিড়াল আড়ার উপর হইতে নাগমহাশয়ের মুখের উপর লাফাইয়া পড়িয়াছে। মাতাঠাকুরাণী শীঘ্র প্রদীপ জ্বালিলেন, দেখিলেন বিড়ালের নখাঘাতে নাগমহাশয়ের বামচক্ষুর শ্বেতাংশ কিয়ৎপরিমাণে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। মাতাঠাকুরাণী কাঁদিতে লাগিলেন। নাগমহাশয় বলিলেন, "ও কিছু নয়, ও কিছু নয়।" তারপর বলিলেন, "এই ছাই-ভস্ম দেহের কথা কেন ভাব? ঠাকুরের ইচ্ছায় তিনিই বিড়ালরূপে আমার প্রাক্তন পাপের সাজা দিয়ে গেলেন। এই সবই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দয়া মাত্র!" জগৎসংসার তিনি শ্রীরামকৃষ্ণময় দেখিতেন। আমাদের বিশেষ পীড়াপীড়িতে চোখে দুই-চারি দিন জলের পটি দিলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় তাহাতে চোখটি সারিয়া গেল।

কলিকাতায় একবার তাঁহার দুই হাতে ভয়ানক ব্যথা ধরে। হাত নাড়িতে পারিতেন না, এবং জোড় করিয়া না থাকিলে দারুণ যন্ত্রণা হইত। তিনি বলিতেন, "সর্বদা জোড়হস্তে থাকিতে শিক্ষা দিবার জন্য ঠাকুর তাঁহাকে এই ব্যাধি দিয়াছিলেন।"

যখন শূলবেদনায় দারুণ কাতর, তখনও তাঁহাকে বলিতে

শুনিয়াছি, "জয় প্রভু রামকৃষ্ণ, তোমারই জয়! এ ছাই হাড়-মাঁসের খাঁচা যখন তোমার সেবায় লাগান গেল না, তখন এই ব্যাধি দিয়ে এর ঠিক উপযুক্ত শাস্তিই বিধান করেছ! শূলব্যথা দিয়ে দয়া করে তোমাকে স্মরণ করাচ্ছ! ধন্য সে শূলব্যথা—যাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্মরণ করিয়ে দেয়! ধন্য তুমি! ধন্য তোমার কৃপা! গুরুকৃপা হি কেবলম্! গুরুকৃপা হি কেবলম্! নিজগুণে কৃপা ভিন্ন জীবের আর উপায় নেই।"

নাগমহাশয় কখন কাহাকেও শিক্ষা দিবার গৌরব করিতেন না। কেহ কোন বিষয় বুঝিতে চাহিলে তিনি বলিতেন, "কে কারে কি বুঝাইতে পারে? সময়ে ঠাকুরের কৃপায় জীবের অন্তশ্চক্ষু আপনা-আপনি খুলিয়া যায়, তখন 'যথা যথা নেত্র পড়ে, তথা তথা কৃষ্ণ স্ফুরে'; তখন সে যে দিকে চাহে সব নূতন রঙ্গে রঞ্জিত দেখিতে পায়।" কিন্তু যখনি কাহাকেও হতাশ দেখিতেন তখনি তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলিতেন, "শেষ জন্ম না হলে শ্রীরামকৃষ্ণনামে বিশ্বাস হয় না।" আরও বলিতেন, "ভগবানে ঠিক ঠিক বিশ্বাস ভক্তি থাকিলে কখন বেতালে পা পড়ে না, ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—চতুর্বর্গলাভ হয়।"

শ্রীযুত গিরিশ বলেন, "নরেনকে (পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ) ও নাগমহাশয়কে বাঁধতে গিয়ে মহামায়া বড়ই বিপদে পড়েছেন। নরেনকে যত বাঁধেন তত বড় হয়ে যায়, মায়ার দড়ি আর কুলোয় না। শেষে নরেন এত বড় হল যে মায়া হতাশ হয়ে তাঁকে ছেড়ে দিলেন। নাগমহাশয়কেও মহামায়া বাঁধতে লাগলেন। কিন্তু মহামায়া যত বাঁধেন, নাগমহাশয় তত সরু হয়ে যান। ক্রমে এত সরু হলেন যে, মায়াজালের মধ্য দিয়ে গলে চলে গেলেন।"

ভক্তসঙ্গে

নাগমহাশয়ের কেহ মন্ত্রশিষ্য আছে বলিয়া জানা নাই। শাস্ত্রীয়-বিধিব্যবস্থা তিনি কখন লঙ্ঘন করিতেন না। কাহাকেও সেরূপ করিতে দেখিলে তিনি নিরতিশয় দুঃখিত, এমন কি বিরক্ত হইতেন। শূদ্রের মন্ত্র দিবার অধিকার নাই, সে বিধি কখন ব্যতিক্রম করিতেন না। তাঁহার কৃপায় অনেকের হৃদয়ে চৈতন্য-সঞ্চার হইয়াছে, অনেক উচ্ছৃঙ্খল জীবন পরিবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু গুরুশিষ্যভাব কখন তাঁহার মনে স্থান পায় নাই। কেহ গুরু বলিয়া সম্বোধন করিলে তিনি মাথা খুঁড়িতেন। বলিতেন, "আমি শূদ্দুর খুদ্দুর, আমি কি জানি? আমাকে আপনারা পদধূলি দিয়া পবিত্র করিতে আসিয়াছেন। ঠাকুরের কৃপায় আপনাদের দর্শন করিতে পারিলাম।"

নাগমহাশয়ের জনৈক ব্রাহ্মণ-ভক্ত দীক্ষার জন্য একবার তাঁহাকে নিতান্ত পীড়াপীড়ি করিয়া ধরে। তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, "একে ব্রাহ্মণ, তাহাতে আপনি শিক্ষিত, এ সঙ্কল্প আপনার সর্বথা ত্যাগ করা উচিত। সমাজমর্যাদা ও শাস্ত্রানুশাসন না মানিয়াই লোকের যত দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে। ঠাকুরের আদেশে আমায় এ জীবনে ঠিক ঠিক গৃহস্থের ধর্ম পালন করিয়া যাইতে হইবে, তাহার এক চুল এদিক ওদিক করিবার সাধ্য আমার নাই।" তারপর ভক্তটির বিষণ্ণ ভাব দর্শন করিয়া তিনি আশীর্বাদ করিয়াছিলেন, "আপনার ভাবনা নাই, সাক্ষাৎ সদাশিব আপনার মন্ত্রদাতা

গুরু হইবেন।" কিছুদিন পরে নাগমহাশয় শুনিতে পান—উক্ত ভক্ত স্বামী বিবেকানন্দের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে নাগমহাশয় পরমাহ্লাদিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "ইদানীন্তন কালে ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তগণই জগতের একমাত্র দীক্ষাগুরু। ইঁহাদের নিকট যাঁহারা দীক্ষাগ্রহণ করিবেন, তাঁহারা ধন্য হইবেন।"

নাগমহাশয়ের কেহ মন্ত্রশিষ্য না থাকিলেও তাঁহার ভক্তপরিবার বিশাল। গিরিশবাবু বলেন, "নাগমহাশয় তাঁহার ভক্তগণের উপর স্নেহময়ী জননীর ন্যায় সর্বক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন।" দূরে বা নিকটে, সমক্ষে বা অন্তরালে, সে স্নেহদৃষ্টি সকলের উপর সর্বকালে সমভাবে নিপতিত থাকিত। একবার একটি ভক্ত তাঁহাকে দেখিবার জন্য দেওভোগে আসিতে নিতান্ত ব্যাকুল হয়। ভক্তটি ঢাকা কলেজে পড়িত; ঢাকা হইতে যখন ট্রেণযোগে নারায়ণগঞ্জে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। সে সময় বর্ষাকাল, চারিদিক জলে জলময়। একে অন্ধকার, তাহার উপর আকাশ ঘোরমেঘাচ্ছন্ন; অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। নারায়ণগঞ্জের শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ জীউর মন্দিরের নিকট হইতে দেওভোগ যাইবার পথ। বর্ষাকালে নৌকাযোগে যাইতে হয়। ভক্তটি দেখিল একখানিও নৌকা নাই। নিরুপায় হইয়া ভক্তটি প্রতিজ্ঞা করিল, সে অগাধ জলরাশি সাঁতার দিয়া পার হইয়া যাইবে। নাগমহাশয়কে স্মরণ করিয়া ভক্তটি প্রবল প্লাবনে ঝম্প প্রদান করিল। ক্রমে সাঁতার দিতে দিতে রাত্রি ৯টায় তাহার অসাড় ক্লান্তদেহ নাগমহাশয়ের বাড়ীর উত্তর ধারের বাগানে আসিয়া ঠেকিল। তখনও প্রবলবেগে বৃষ্টি পড়িতেছে। ভক্ত দেখিল,

নাগমহাশয় সেইখানে তাহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ভক্তটি বলেন, "আমাকে দেখিয়াই নাগমহাশয় বলিয়া উঠিলেন—হায়! হায়! কি করেছেন? কি করেছেন? কত দুরন্ত সাপ এ সময় মাঠে ভেসে বেড়ায়, এমন বর্ষার দুর্যোগের সময় কি আস্‌তে হয়?" ভক্তটি নিরুত্তরে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

গৃহে পৌঁছিতেই মাতাঠাকুরাণী তাহাকে একখানি শুষ্কবস্ত্র দিলেন, আর তার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি সুমিষ্ট ভৎর্সনাও করিলেন। মায়ের স্নেহের তিরস্কার শুনিয়া ভক্তটি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "নাগমহাশয়কে না দেখিয়া থাকা আমার পক্ষে বিষম দায় হইয়াছে।" ভক্তটি প্রতি শনিবার কলেজ বন্ধ হইলে দেওভোগে আসিত। তারপর তাহার রন্ধনের উদ্যোগ করিতে গিয়া মাতাঠাকুরাণী দেখিলেন—একখানিও শুক্‌নো কাঠ নাই। নাগমহাশয় সে কথা শুনিতে পাইয়াই তাঁহার দক্ষিণ দিকের ঘরের একটি খুঁটি কাটিতে আরম্ভ করিলেন। ভক্তটির কোন নিষেধ তিনি শুনিলেন না। মাতাঠাকুরাণী বলিলেও নাগমহাশয় খুঁটি কাটিতে কাটিতে বলিতে লাগিলেন, "যাঁরা প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করে সাপের মুখে সাঁতার কেটে আমাকে দেখতে আসেন, তাঁদের জন্য কি একখানা সামান্য ঘরের মায়া পরিত্যাগ করতে পারি না? প্রাণ দিয়েও আমি এঁদের উপকার করতে পারলে তবে আমার এ দেহ সার্থক হয়!" শ্রীমতী নিবেদিতার 'The Master as I saw Him' গ্রন্থে এই ঘটনাটি বিশেষরূপে বর্ণিত আছে। ভক্তটি বলেন, "নাগমহাশয়ের অপার কৃপাই যে সেদিন তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

আর একবার এই ভক্তকে নাগমহাশয় আত্মহত্যারূপ মহাপাপ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। ভক্ত তখন কলিকাতার মেসে থাকিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কলেজে বি-এ পড়ে। ভক্তটি বলে, "একদিন রাত্রে আমি ছাত্রাবাসের ছাদে একাকী বেড়াইতেছি। চারিদিক শান্ত, নির্মল চন্দ্রালোকে আলোকিত, কেবল আমার হৃদয়ে দারুণ অশান্তি। নাগমহাশয়ের অদর্শনব্যথা, দেওভোগের স্মৃতি আমার অন্তরে হু হু করিয়া জ্বলিতেছে। তখনও আমার শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণের সহিত পরিচয় হয় নাই যে, নাগমহাশয়ের কথা বলিয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিব। নাগমহাশয় প্রতিবৎসর শারদীয়া পূজার পূর্বে একবার করিয়া কলিকাতায় পূজার দ্রব্যাদি কিনিতে আসিতেন। কিন্তু সে সময় অবধি অপেক্ষা করিতে আমার ধৈর্য রহিল না। কেবলই মনে হইতে লাগিল—হায়, এমন মহাপুরুষকে পাইয়া হারাইলাম! তবে আর জীবনধারণের প্রয়োজন কি? ভাবিতে ভাবিতে আমার মনে হইল, ছাদ হইতে পড়িয়া আত্মহত্যা করিব। দৃঢ়সংকল্প করিয়া যেমন পড়িতে যাইব, অমনি শুনিতে পাইলাম কে যেন বলিল—'আগামী কল্য প্রাতেই নাগমহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইবে।' আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তাড়াতাড়ি ছাদ হইতে নামিয়া ঘরে গিয়া বিছানায় শয়ন করিলাম এবং পরে ঘুমাইয়া পড়িলাম।" পরদিন প্রাতে উঠিয়া ভক্তটি মুখ ধুইতে যাইতেছে, শুনিল কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দেখিল—একটি কাপড়ের পুঁটুলি হাতে করিয়া নাগমহাশয় দাঁড়াইয়া আছেন। ভক্তকে দেখিয়া নাগমহাশয়

ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "আপনি কি করিতেছেন ভাবিয়া ভাবিয়া আমাকে কলিকাতায় আসিতে হইয়াছে। ভয় কি? ভাবনাই বা কিসের? যখন ঠাকুরের রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তখন আর ভাবনা নাই। আত্মনাশ মহাপাপ।" তাহার পর বলিলেন, "এতদিন খালে বিলে ছিলেন, এবার সমুদ্রে (শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলার মহাসমুদ্র) এসে পড়লেন।" পরে এই ভক্তটিকে একদিন বেলুড় মঠে লইয়া গিয়া তিনি সন্ন্যাসি-ভক্তগণকে বলেন, "এই বাবুটি বড় চঞ্চল; এঁকে আপনারা কৃপা করে পায়ে রাখবেন। এঁর খুব বুদ্ধিশুদ্ধি। যাতে ঠাকুর এঁকে কৃপা করেন, তাই দেখবেন।"

যেসকল ভক্ত নাগমহাশয়ের নিকট সর্বদা যাতায়াত করিতেন, তিনি তাঁহাদিগকে বলিতেন, "আপনারা আপনার চেয়েও আপনার। আমার জীবন দিয়েও আপনাদের যদি কিছু হয় ত হোক! এ ছাই হাড়মাঁসের খাঁচা দিয়ে আর কি হবে?"

ভক্তগণের মধ্যে কে ছোট, কে বড় বলা যায় না। বিশেষতঃ সকলের সহিত লেখকের পরিচয়ও নাই এবং অনেকের নাম তাহার জানা নাই। অজ্ঞতাবশতঃ এই গ্রন্থে যাঁহাদের নামোল্লেখ হইল না, তাঁহারা নিজগুণে লেখককে মার্জনা করিবেন।

নাগমহাশয়ের ভক্তগণের মধ্যে প্রথমেই মাতাঠাকুরাণীর নাম উল্লেখযোগ্য, কেন-না ভক্তপ্রসঙ্গে তাঁহারই স্থান সর্বাগ্রে।

নাগমহাশয়ের যেকোন ভক্ত তাঁহার গৃহে রাত্রিযাপন করিয়াছেন, তিনিই দেখিয়াছেন মাতাঠাকুরাণী অতি প্রত্যূষে সর্বাগ্রে জাগরিত হইয়া গৃহকার্য করিতেছেন। সংসারের সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া তিনি স্নানান্তে পূজায় বসিতেন, তাহার পর রন্ধন করিয়া

অতিথি-অভ্যাগতদিগের ভোজনের পর অগ্রে নাগমহাশয়কে আহার করাইয়া পরে আপনি যৎকিঞ্চিৎ প্রসাদ পাইতেন।

সংসারের সকল কার্য মাতাঠাকুরাণী একা সম্পন্ন করিতেন, এমনকি তাঁহার ভগ্নী শ্রীমতী হরকামিনীকেও কিছুতে হস্তক্ষেপ করিতে দিতেন না। নাগমহাশয়ের ভক্তগণের মধ্যে এখনও যাঁহারা দেওভোগে গমন করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে বলেন যে, মাতাঠাকুরাণীর যত্ন, উদ্যম, সেবা, সহনশীলতা প্রভৃতির কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। পূর্বে যেমন এখনও তেমনি দশ হাতে দশ দিকে কাজ করিয়া বেড়ান। নাগমহাশয়ের ভক্তগণকে তিনি আপন সন্তানজ্ঞানে স্নেহযত্ন করেন এবং তাঁহারাও মাতাঠাকুরাণীকে নিজ জননীর ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি করেন। নাগমহাশয়ের পুণ্যস্মৃতি ও পবিত্র ভস্মরাশি বক্ষে ধারণ করিয়া দেওভোগ এখন পরম তীর্থস্থান হইয়াছে। পুণ্যশ্লোক নাগমহাশয়ের সমাধি-স্থান দর্শন করিতে তথায় বহু লোকের সমাগম হয়; তন্মধ্যে যাঁহারা নাগমহাশয়ের জীবদ্দশায় তাঁহাকে দর্শন করিতে তথায় গিয়াছিলেন, তাঁহারা বলেন—যত্নে, আদরে, অতিথি সৎকারে সেই মহাপুরুষের পবিত্র প্রভাব দেওভোগে এখনও জীবন্ত রহিয়াছে।

পতি ভিন্ন মাতাঠাকুরাণীর অন্য ইষ্ট কখনই ছিল না, এখনও নাই। নাগমহাশয়ের ছবি পূজা না করিয়া তিনি জলগ্রহণ করেন না। এক বৎসর মহাষ্টমী পূজার দিন নাগমহাশয়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে মাতাঠাকুরাণীর একান্ত ইচ্ছা হয়। তাহাতে নাগমহাশয় বিরক্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু এক সময় তিনি ঘরের কোণে অন্যমনস্ক হইয়া দাঁড়াইলে মা সেই অবসরে সহসা তাঁহার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান

করেন। নাগমহাশয় তাহাতে বলেন, "যাকে পূজা করে, তার কি আবার সেবা পূজা নেয়?" মাতাঠাকুরাণী সেই অর্পিত পুষ্পাঞ্জলির ফুলগুলি কুড়াইয়া একটি স্বর্ণকবচে পুরিয়া গলদেশে ধারণ করেন।

হরপ্রসন্ন বাবু যখন প্রথম নাগমহাশয়ের নিকট গমন করেন, মাতাঠাকুরাণীকে দেখিয়া তাঁহার মনে হইয়াছিল—সাধুর আবার স্ত্রী পরিবার কেন? নাগমহাশয় তাঁহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "কেন? কেন? দোষ কি? মা অন্নপূর্ণা খাবার যোগাড় করিয়া দিতেছেন।" স্নেহ, দয়া, ত্যাগ, তিতিক্ষা, পরার্থপরতা প্রভৃতির জীবন্ত ছবি মাতাঠাকুরাণীকে দেখিলে মনে হয়, তপস্যা মূর্তিমতী হইয়া আদর্শ রমণীরূপে বিরাজ করিতেছেন!

নাগমহাশয় জীবিত থাকিতে যেসকল ভক্ত নিয়মিতরূপে প্রতি শনিবার দেওভোগে যাইতেন, মা তাঁহাদের জন্য বহুবিধ মিষ্টপিষ্টকাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিতেন। নাগমহাশয়ের বাটীতে বর্ণাশ্রম-ধর্মের একচুল এদিক-ওদিক হইবার জো ছিল না। ব্রাহ্মণকে স্বহস্তে রাঁধিয়া খাইতে হইত। ব্রাহ্মণের আহারের সময় নাগমহাশয় বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিতেন, মা নিকটে থাকিয়া যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন। দেওভোগে আসিয়া কেহ কখন মনে করিতে পারিত না যে, সাধুর আশ্রমে আসিয়াছি। সকলেরই মনে হইত যেন আপনার পিতামাতার কাছে আসিয়াছি। নাগমহাশয় লোকান্তরিত হইবার পর পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে একবার দেওভোগে গমন করেন। স্বামীজি আসিবেন শুনিয়া নাগমহাশয় তাঁহার জন্য শৌচ প্রভৃতির

স্থান প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন। স্বামীজিও বলিয়াছিলেন, নাগমহাশয়ের বাটী গিয়া তিনি দেশীয় প্রথানুসারে শৌচ স্নানাহারাদি করিবেন। স্বামীজি সর্বতোভাবে স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন। একদিন দেওভোগে বাস করিয়া স্বামীজি ঢাকা অঞ্চলে গমন করেন। যাইবার সময় মাতাঠাকুরাণী তাঁহাকে একখানি বস্ত্র উপহার দেন। স্বামীজি সেই বস্ত্রে উষ্ণীষ বন্ধন করিয়া নাগমহাশয়ের গুণগান করিতে করিতে দেওভোগ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। এই অঞ্চলে প্রচারকার্যে আসিবার পূর্বে স্বামীজি নাগমহাশয়ের জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন, "ওদেশে গিয়ে আর বক্তৃতা করবার ইচ্ছা বা প্রয়োজন নেই। যে দেশ নাগমহাশয়ের চন্দ্রালোকে আলোকিত, সেখানে আমি গিয়ে আর বেশী কি বলব?" তাহাতে ভক্তটি বলেন, "তিনি ত অতি গুপ্তভাবে ছিলেন, সাধারণে কখনও কিছু বলেন নাই!" স্বামীজি বলিলেন, "মুখে নাই কিছু বলিলেন! নাগমহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষদিগের চিন্তাতরঙ্গে (thought-vibration) দেশের চিন্তাস্রোতের গতি ফিরিয়া যায়।"

মাতাঠাকুরাণীর কনিষ্ঠা ভগ্নী শ্রীমতী হরকামিনী নাগমহাশয় ব্যতীত অন্য কোন দেবতা বা ধর্ম মানেন না। তাঁহার ভক্তি ও সরলতা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি স্বামীর সহিত আজীবন পিতৃগৃহে বাস করেন। নাগমহাশয় তাঁহাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করিতেন এবং তাঁহাকে দেখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে শ্বশুরালয়ে যাইতেন।

শ্রীমতী হরকামিনীর বাড়ীতে রটন্তীপূজা হইত; কিন্তু

নাগমহাশয় উপস্থিত না হইলে প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠাও হইত না এবং পুরোহিতও পূজায় বসিতে পারিতেন না। তিনি জানিতেন, নাগমহাশয় উপস্থিত হইলে প্রতিমায় দেবীর আবির্ভাব হয়।

এক বৎসর শ্রীমতী হরকামিনীর বাড়ীতে এককাঁদি কলা হয়। তিনি স্থির করিয়াছিলেন, ফলের অগ্রভাগ নাগমহাশয়কে দিবেন, কিন্তু তিনি তখন কলিকাতায়। এদিকে কলা পাকিয়া উঠিল। মাতাঠাকুরাণী তাহা কাটিবার জন্য ভগ্নীকে জিদ করিতে লাগিলেন। বলিলেন, "তাঁহার (নাগমহাশয়ের) দেশে ফিরিতে এখনও এক মাস বিলম্ব আছে।" শ্রীমতী হরকামিনী বধির হইয়া রহিলেন। অবশেষে মাতাঠাকুরাণী জোর করিয়া কলা কাটাইয়া ফেলিলেন। শ্রীমতী হরকামিনী তাড়াতাড়ি উৎকৃষ্ট কলাগুলি বাছিয়া বাছিয়া নাগমহাশয়ের জন্য তুলিয়া রাখিলেন, অবশিষ্টগুলি বিলাইয়া দিলেন। ইহার পনর দিন পরে নাগমহাশয় দেশে ফিরেন। শ্রীমতী হরকামিনী সেই কলা লইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তখনও ফলগুলি পচে নাই। নাগমহাশয় তাঁহার ভক্তিদর্শনে অতি প্রীত হইয়া কতকগুলি ফল গ্রহণ করিলেন।

নাগমহাশয়ের উপর যে সকল ভক্তের নির্ভর ছিল, তিনি কখন তাঁহাদের প্রদত্ত দ্রব্য প্রত্যাখ্যান করিতেন না। দেওভোগে কোন ভক্ত একদিন নাগমহাশয়কে মাছ খাওয়াইবার ইচ্ছা করে। মাতা-ঠাকুরাণী তাহা অবগত হইয়া বিশেষ আপত্তি করিতে লাগিলেন। কিন্তু ভক্তটি কোন কথা না শুনিয়া বাজার হইতে তিন-চারি সের ওজনের একটি রুই মাছ কিনিয়া আনিল। মাতাঠাকুরাণী সে মাছে হাতও দিলেন না, কেবল বলিতে লাগিলেন, "বাবা, আজ আবার

না জানি কি কাণ্ড ঘটাবে!" ভক্তটিও মাতাঠাকুরাণীকে জিদ করিয়া বলিতে লাগিল—"তুমি মাছ কোটো না, দেখা যাবে তিনি খান কি না।" নাগমহাশয় তখন বাড়ী ছিলেন না। দুধের জন্য গোয়ালা-বাড়ী গিয়াছিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে মাতাঠাকুরাণী সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন। নাগমহাশয় শুনিয়া ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না। তারপর মৎস্যরন্ধন হইল। তিনি আহার করিলে নাগমহাশয় পাছে মাছ না খান, এই ভয়ে ভক্তটি আগারে বসিলেন না। কিন্তু নাগমহাশয় মৎস্য গ্রহণ করিবেন স্বীকার করিয়া ভক্তটিকে অগ্রে আহার করাইলেন।

শ্রীমতী হরকামিনী সংসারধর্মে একান্ত উদাসীন। রোগে, শোকে, সুখে, দুঃখে ইঁহাকে কেহ কখন বিচলিত হইতে দেখে নাই। নাগমহাশয়ের ভক্তগণকে ইনি সর্বতোভাবে নিজ পরিজন বলিয়া মনে করিতেন।

নাগমহাশয় তাঁহার শাশুড়ীর ভক্তিভাবের বড় প্রশংসা করিতেন। একবার বৃদ্ধা কলিকাতায় আসিয়া কুমারটুলীতে জামাতার বাসায় বাস করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে যাইতেন এবং স্নানান্তে তীরে বসিয়া মাটিতে শিব গড়িয়া পূজা করিতেন। একদিন পূজা করিতে করিতে দেখিলেন—শিবলিঙ্গের অগ্রভাগ ফাটিয়া গিয়াছে। বৃদ্ধার হৃদয় শিহরিয়া উঠিল। শিবলিঙ্গ বিদীর্ণ হওয়া বড় অমঙ্গল। বুড়ী গঙ্গাকূলে বসিয়া আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। সন্ধ্যা সন্নিকট, তখনও শাশুড়ী ফিরিতেছেন না দেখিয়া নাগমহাশয় তাঁহার অন্বেষণে গমন করিলেন। দেখিলেন তিনি একাকিনী ঘাটে বসিয়া কাঁদিতেছেন। শাশুড়ী জামাতাকে সকালের

ঘটনা বলিলেন, জামাতা অভয় দিয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া বাসায় আনিলেন। বুড়ী বাসায় আসিয়া একখানি লেপ মুড়ি দিয়া পড়িয়া রহিলেন। সেদিন আর জলগ্রহণ করিলেন না। রাত্রে শাশুড়ী স্বপ্নে দেখিলেন—বৃষবাহনে মহাদেব তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "তোমার আর পূজার প্রয়োজন নাই, আমি প্রসন্ন হইয়াছি।" বৃদ্ধার নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রাতে উঠিয়াই জামাতাকে অদ্ভুত স্বপ্নকথা বলিলেন। সেই অবধি তাঁহার শিবপূজা শেষ হইল। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "শিবকে জামাই পেয়েছি, আর শিবপূজার দরকার কি?" শাশুড়ী জামাতাকে দূর হইতে নমস্কার করিতেন এবং কাছে আসিয়া ঘোমটা টানিয়া বসিয়া থাকিতেন। বৃদ্ধার তখন প্রায় নবতি বর্ষ বয়স হইয়াছে, কেবল জপধ্যান লইয়াই দিনযাপন করেন।

আমি একবার রটন্তীপূজার সময় নাগমহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার শ্বশুরবাড়ী যাই। তখন নাগমহাশয়ের শাশুড়ীর মাতাও জীবিতা ছিলেন। আমি তাঁহাকে গীতা পাঠ করিয়া শুনাইয়াছিলাম।

নাগমহাশয় বিবাহের পর প্রথম প্রথম শ্বশুরবাড়ীতে খাওয়া দাওয়া করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিবার পর তিনি আর সেথায় জলগ্রহণ করিতেন না। শাশুড়ী সেজন্য সময় সময় আক্ষেপ করিতেন।

নাগমহাশয়ের নাম করিলে বৃদ্ধা বলেন, "ওগো, আমার শিব জামাই লীলাসাঙ্গ করে চলে গেল! আমি মহাপাতকিনী, তাই এখনও বেঁচে আছি!"

নাগমহাশয়ের পিতৃশ্রাদ্ধের সময় যে বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী মাতা-

ঠাকুরাণীকে অর্থ কর্জ দিয়াছিলেন—তিনিও তাঁহার একজন পরম ভক্ত। এই বৃদ্ধা নাগমহাশয়ের প্রতিবাসী চৌধুরীদিগের কন্যা। তিনি বধিরা। ব্রাহ্মণীর পুত্রসন্তানাদি ছিল না, তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত স্নেহ নাগমহাশয় ও তাঁহার গৃহিণীকে আশ্রয় করিয়াছিল। তিনি নাগমহাশয়কে 'দুর্গাচরণ' এবং মাতাঠাকুরাণীকে 'বউ' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। নাগমহাশয় ইঁহাকে মাতার ন্যায় মান্য করিতেন এবং সংসারের সকল কার্যে তাঁহার উপদেশ লইয়া চলিতেন। বৃদ্ধাকে লোকে কৃপণ বলিত, তাঁহার হাতে কিছু সঞ্চিত অর্থ ছিল। নাগমহাশয়ের সাংসারিক কষ্ট দেখিয়া ব্রাহ্মণীর একান্তই ইচ্ছা ছিল নাগমহাশয়কে কিছু দান করেন, কিন্তু তাঁহার সে বাসনা কখনও চরিতার্থ হয় নাই। নিতান্ত আবশ্যক হইলে নাগমহাশয় তাঁহার কাছে যদি কখন কিছু কর্জ করিতেন, টাকা হাতে পাইলে তাহা পরিশোধ করিয়া ফেলিতেন।

বহুলোকসমাগমে মাতাঠাকুরাণীকে অপরিমিত শ্রম করিতে দেখিয়া ব্রাহ্মণী ব্যথিতা হইয়া বলিতেন, "বউ আমার খেটে খেটে মরে যেতে বসেছে।"

চৌধুরীবাটীর উপর দিয়া নাগমহাশয়ের বাড়ী আসিবার পথ ছিল। সে পথ দিয়া কাহাকেও নাগমহাশয়ের বাটীতে আসিতে দেখিলে ব্রাহ্মণী বলিতেন, "ইহারা সাধুকে দেখিতে যাইতেছে!" বৃদ্ধা নাগমহাশয়কে মহাপুরুষ বলিয়া জানিতেন এবং তদনুরূপ ভক্তিও করিতেন।

বধূঠাকুরাণী (শ্রীযুক্ত হরপ্রসন্ন দাদার স্ত্রী) স্ত্রীভক্তগণের মধ্যে সর্বপ্রধান। ইঁহার পত্র আমি প্রথম অধ্যায়ে উদ্ধৃত করিয়াছি, এবং

ইঁহারই সম্বন্ধে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, "তোদের বাঙ্গাল দেশে ঐ একজন স্ত্রীলোক দেখে এলুম—যেমন বিদুষী, তেমনি ভক্তিমতী।" নাগমহাশয় তাঁহাকে 'মা' বলিয়া ডাকিতেন এবং পঞ্চবর্ষীয় শিশুর ন্যায় তাঁহার হস্তে খাদ্য গ্রহণ করিতেন।

কুমারটুলীর পালবাবুদের জন্মভূমি ভোজেশ্বর গ্রামে এক বৎসর মড়ক হইলে পালবাবুরা নাগমহাশয়কে তথায় লইয়া যান। নাগমহাশয়ের আগমনে মড়কশান্তি হয়। বাবু হরলাল পাল বলেন, "যখনই তাঁহাদের গ্রামে মারীভয় উপস্থিত হইত, তাঁহারা নাগমহাশয়কে তথায় লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার গমনে মারীভয়-শান্তি হইত।" এই বার ভোজেশ্বরে আসিয়া বধূঠাকুরাণীকে দেখিবার জন্য নাগমহাশয় একবার হরপ্রসন্ন বাবুর দেশে গমন করেন। বধূঠাকুরাণী তাঁহাকে পূর্বে দেখেন নাই, কেবল শুনিয়াছিলেন তাঁহার স্বামী এক সাধুর নিকট গমন করেন। নাগমহাশয়কে দেখিয়াই তাঁহার মনে হইয়াছিল যে, ইনিই সেই সাধু। নাগমহাশয়কে কিছু আহার করাইবার জন্য বধূঠাকুরাণীর একান্ত ইচ্ছা হয়, সে সময় তাঁহাদের মৃতাশৌচ ছিল, কিন্তু নাগমহাশয় তাহা গ্রাহ্য না করিয়া বধূর হস্তপ্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন পরম তৃপ্তির সহিত খাইয়াছিলেন। বধূর পরিধানে ছিন্ন বস্ত্র দেখিয়া পালংবাজার হইতে দুইখানি লালপেড়ে কাপড় কিনিয়া বধূকে দিয়া আসেন। এই অন্নগ্রহণ-ঘটনার উল্লেখ করিয়া হরপ্রসন্নবাবু আমাকে বলিয়াছিলেন, "ওহে ভায়া, আমাদের অদৃষ্ট ভাল; আমাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্যই তিনি নরশরীরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার দয়াতেই আমরা এ জন্মে অভয়ের পারে চলিয়া যাইব।"

লেখকের জন্মভূমি ভোজেশ্বর হইতে দেড় ক্রোশ দূরে। নাগমহাশয় যে সময় ভোজেশ্বর গমন করেন আমি তখন বাড়ীতে ছিলাম। নাগমহাশয় আসিয়াছেন শুনিয়া আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। আমাকে দেখিয়া নাগমহাশয় বলিলেন, "কি করি, এঁরা অন্ন দেন, এঁদের কথা না শুনে কি করি! তাই আসতে হলো।" বৈকালে তাঁহাকে আমাদের বাটীতে লইয়া গেলাম। তিনি সেখানে আমাদের গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী কাত্যায়নীকে দেখিয়া পরম প্রীত হইয়াছিলেন। আমার পিতাকে প্রণাম করিলেন। এখানেও তিনি আমার পরিবারের হস্তে অন্ন গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ধন্য করেন। পরদিন তাঁহার সহিত ভোজেশ্বরে ফিরিয়া যাইবার পথে তর্করত্ন-উপাধিধারী কোন পণ্ডিত আমাকে বলিলেন, "এ পাগলের সঙ্গে তুমি কোথায় যাইতেছ?" আমি উত্তর দিলাম, "পাগল বটে, তবে আমরা কামিনী-কাঞ্চন লইয়া পাগল, আর ইনি ঈশ্বরপ্রেমে পাগল।"

বধূঠাকুরাণী মধ্যে মধ্যে দেওভোগে আসিয়া বাস করিতেন। যখনই তথা হইতে ঢাকায় যাইতেন, নাগমহাশয় সঙ্গে যাইয়া অনেক দূর পর্যন্ত রাখিয়া আসিতেন। একবার যাইতে যাইতে শ্রীশ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণজীউর বাড়ীর নিকট এক বৃদ্ধা বৈষ্ণবীর সহিত দেখা হয়। বৈষ্ণবী ভিক্ষা করিত, সেজন্য অনেককেই সে চিনিত। বধূ-ঠাকুরাণীকে দেখাইয়া নাগমহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিল, "উনি তোমার কে?" নাগমহাশয় বলিলেন, "আমার মা।" বৈষ্ণবী জানিত নাগমহাশয় মাতৃহীন, বলিল, "তোমার মা ত অনেক কাল মরিয়া গিয়াছেন। এ তবে তোমার কেমন মা?" নাগমহাশয়

বলিলেন, "এ আমার সত্যি মা, সত্যি মা!" ভিখারিণী বুঝিল, বলিল, "হাঁ বুঝেছি, এ তোমার সত্যি মা; নৈলে কি, বাবা, সাধু বলে তোমার নাম দেশবিদেশে রটনা হয়! বেঁচে থাক, দেশের মুখ উজ্জ্বল কর।"

বধূঠাকুরাণীর মত স্ত্রীলোক আমি অল্পই দেখিয়াছি। দেও-ভোগে আমার সঙ্গে যেদিন তাঁহার প্রথম পরিচয় হয়, শুনিয়া-ছিলাম তিনি সুন্দর গান করেন, আমাকে একটি শুনাইতে বলিলাম। তিনি কোনরূপ দ্বিধা না করিয়া গাহিলেন, "মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।" একে সুন্দর কণ্ঠস্বর, তাহার উপর তাঁহার তন্ময়ভাব, আমি মুগ্ধ হইয়া—নীরব হইয়া শুনিতেছি, নাগমহাশয় বলিয়া উঠিলেন—"মায়ের নাম মা নিজেই গাহিতেছেন। 'আপন সুখে আপনি নাচ, আপনি দেও মা করতালি।'"

নাগমহাশয় বলিতেন, "ইনি (বধূঠাকুরাণী) বিদ্যামায়া দেবী সরস্বতীর অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।" এই মাতৃস্বরূপিণী মানস কন্যাকে নাগমহাশয় তাঁহার বাল্যজীবনের অনেক কথা বলিয়াছেন। তাহার কতকাংশ আমরা প্রথম অধ্যায়ে পাঠককে উপহার দিয়াছি। বধূঠাকুরাণীর পতিপুত্রও নাগমহাশয়ের পরম ভক্ত।

নাগমহাশয়ের গর্ভধারিণী ত্রিপুরাসুন্দরীর এক জ্যেঠাইমা ছিলেন, তাঁহার নাম মাধবীঠাকুরাণী। নাগমহাশয় তাঁহাকে ঠাকুরমাতা বলিয়া ডাকিতেন। ঢাকার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে মাধবীঠাকুরাণীর বাস ছিল। পূর্ববঙ্গে এখনও ইঁহার নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

সুরেশবাবু বলেন—মাধবীঠাকুরাণী একবার কলিকাতায় আসিয়া নাগমহাশয়ের বাসায় তিন-চারি দিন ছিলেন। সে সময় তিনি

সামান্য দুগ্ধ ও ফল আহার করিয়া জীবনধারণ করিতেন। তিনি চিরজীবন ব্রহ্মচারিণী ; সাধনভজন এবং অতিথিসেবা ভিন্ন তাঁহার আর কোন কার্য ছিল না। নাগমহাশয় বলিতেন, ধর্মসম্বন্ধে এমন উন্নতা স্ত্রীলোক তিনি আর দেখেন নাই। তাঁহার যেমন অসামান্য ত্যাগ, তেমনি সেবাভাব ছিল। নাগমহাশয় মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতেন এবং তিনিও নাগমহাশয়কে দেখিতে কখন কখন দেওভোগে আসিতেন। মাধবীঠাকুরাণী নাগমহাশয়কে বলিতেন, "সাগরছেঁচা মানিক!"

শ্রীযুক্ত হরপ্রসন্ন মজুমদার মাধবীঠাকুরাণীর বিস্তৃত জীবনী 'উদ্বোধন' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছেন।

গৃহস্থ স্ত্রীভক্তগণের মধ্যে যাঁহাদিগকে আমি জানি বা মাধবী-ঠাকুরাণীর ন্যায় যাঁহাদের বিবরণ বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি, তাঁহাদেরই নামমাত্র এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম।

দেওভোগের নিকটবর্ত্তী কাশীপুর গ্রামে একজন মুসলমান বাস করিতেন ; নাগমহাশয়ের উপর তাঁহার অসীম শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। নাগমহাশয় বলিতেন, "মুসলমান হইলে কি হয়, তাঁহার মত সাত্ত্বিক ভাব অনেক ব্রাহ্মণেও দেখা যায় না।" এই মুসলমানের প্রায় সত্তর বৎসর হইয়াছিল ; অল্প বয়সে স্ত্রীবিয়োগ হইলেও তিনি আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন নাই। পুত্রের উপর সংসারভার দিয়া নিশ্চিন্তমনে ঈশ্বরচিন্তা করিতেন। তিনি সর্বদাই নাগমহাশয়কে দেখিতে আসিতেন, আসিয়া তাঁহাকে দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেন, কিন্তু হীনজাতি বলিয়া তাঁহার বাটীর ভিতর প্রবেশ করিতেন না। নাগমহাশয়

সেজন্য অতিশয় দুঃখিত হইতেন। তিনি এই মুসলমানকে ভক্তি-সহকারে প্রণাম করিতেন এবং অতি প্রীতির সহিত তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেন। মুসলমান নাগমহাশয়ের পরামর্শ না লইয়া কোন কার্য করিতেন না; নাগমহাশয়ের আদেশ তিনি খোদার আদেশস্বরূপ গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহাকে সাক্ষাৎ 'পীর' বলিয়া জানিতেন। এই মুসলমান সাধুর ঐকান্তিক কামনা ছিল কোন প্রকারে নাগমহাশয়ের কোনরূপ সেবা করেন, কিন্তু নাগমহাশয় তাঁহাকে উচ্চদরের ভক্ত জানিয়া সর্বদা মান্য করিতেন এবং উহা কখন করিতে দেন নাই।

সুরেশবাবু একবার দেওভোগে গিয়া এই মুসলমানকে দেখিয়াছিলেন। নাগমহাশয় তাঁহাকে এই মুসলমানের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "ভগবানের রাজ্যে জাতিবর্ণের বিভাগ নাই। সকলেই ভগবানের কাছে সমান। যাঁহারা ভগবানের শরণাপন্ন হন, যে নামে যে ভাবে সাধন করুন না কেন, যথার্থ অকপটভাবে ডাকিলে ভগবান তাঁহাকে অবশ্যই কৃপা করেন। জগতের নানা মত, নানা পথ কেবল ভগবানের রাজ্যে যাইবার বিভিন্ন রাস্তামাত্র। অকপট মনে দার্ঢ্যভাবে যেকোন ভাবাশ্রয়ে ভগবানকে লাভ করা যাইতে পারে।"

নাগমহাশয়ের অমোঘ কৃপায় যেসকল লোকের জীবনপ্রবাহ পরিবর্তিত হইয়াছিল, দেওভোগ-নিবাসী শ্রীযুক্ত কালীকুমার ভুঁইয়া তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। বাল্যজীবনে কালীকুমার অতি দরিদ্র ছিলেন। তাঁহার মাতা এক ব্রাহ্মণগৃহে দাসত্ববৃত্তি করিতেন। এই ব্রাহ্মণের যত্নে কালীকুমারকে দেওভোগগ্রামবাসী ধনাঢ্য

রতনবাবুর বাড়ীতে পোষ্যপুত্র দেওয়া হয়। কালীকুমার যৌবনে অতিশয় চপলস্বভাব ছিলেন; স্বভাবদোষে ইনি যথাসর্বস্ব খোয়াইয়া পথের ভিখারী হন। নাগমহাশয়ের সংস্পর্শে আসিলেও তাঁহার যৌবনসুলভ চাঞ্চল্য একেবারে দূর হয় নাই। সেজন্য নাগমহাশয় প্রথম প্রথম তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। কালীকুমার আত্মকৃত অপরাধ স্মরণ করিয়া সর্বদা বিষণ্ণমনে নাগমহাশয়ের বাড়ীতে বসিয়া থাকিতেন। একদিন দেখিয়াছি, কোন কথাপ্রসঙ্গে কালীকুমার নাগমহাশয়ের ঘরের খুঁটিতে মাথা খুঁড়িতেছেন। নাগমহাশয় সেদিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না, অধিকন্তু বলিলেন, "যাহার যেমন কর্ম, ভগবান তাহাকে তেমনি ফল দেন।" আমি পূর্বে আর তাঁহার তেমন কঠোর ভাব দেখি নাই। কাতর হইয়া কালীকুমারকে স্নেহদৃষ্টিতে দেখিবার জন্য মিনতি করিলাম। যিনি কোন দিন আমার কোন প্রার্থনা উপেক্ষা করেন নাই, তিনি আজ তাহা অগ্রাহ্য করিলেন।

কালীকুমার সম্পর্কে নাগমহাশয়ের সম্বন্ধী ছিলেন। তাঁহার হাবভাব তিনি সর্বতোভাবে অনুকরণ করিতে পারিতেন; নাগমহাশয়ের ন্যায় সর্বদা জোড়হাত করিয়া থাকিতেন এবং নতনয়নে পথ চলিতেন। কালীকুমারের গলায় একগাছি তুলসীর মালা ছিল। ক্রমে তাঁহার অবিদ্যাসম্বন্ধ ত্যাগ হইল, তিনি বৃন্দাবনে গেলেন। বৃন্দাবনধাম হইতে ফিরিয়া আসিবার পর নাগমহাশয় তাহাকে স্নেহচক্ষে দেখিতেন। তিনি এখনও মধ্যে মধ্যে তীর্থপর্যটনে যান এবং সর্বদা নাগমহাশয়ের পবিত্র জীবনবেদ স্মরণ অনুকরণ করিয়া দিনযাপন করেন।

নাগমহাশয়কে উপহার দিবার জন্য কালীকুমার একদিন মুটের মাথায় দিয়া অনেক জিনিসপত্র নাগমহাশয়ের বাটীতে আনয়ন করেন। সেদিন দেওভোগে সুরেশবাবু উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, নাগমহাশয় কালীকুমারকে কাকুতি মিনতি করিয়া সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী ফিরাইয়া দিলেন। অধিকন্তু সেদিন তাঁহাকে নিজ বাটীতে নিমন্ত্রণ করিয়া সুরেশের সহিত ভোজন করাইলেন।

এক বৎসর শ্রীসত্যগোপাল ঠাকুর ঢাকায় কীর্তন করিতে আসেন। তাঁহারই মুখে নাগমহাশয়ের কথা শুনিয়া শ্রীযুক্ত হরপ্রসন্ন মজুমদার ও আমি তাঁহার সঙ্গে দেওভোগে সাধুদর্শনে গমন করি। দেওভোগে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইল। পরদিন প্রাতে সত্যগোপালের বাটীতে কীর্তন আরম্ভ হইলে আমরা দেখিলাম অতি দীনহীন বেশে একব্যক্তি আসিয়া সাষ্টাঙ্গ হইয়া পড়িলেন। সত্যগোপালও তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তাহার পর আবার কীর্তন চলিতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে সাধুর অপূর্ব ভাবাবেশ হইতেছে। কীর্তন শেষ হইলে নাগমহাশয় 'জয় রামকৃষ্ণ' ধ্বনি করিতে করিতে তাঁহার গৃহাভিমুখে চলিলেন। হরপ্রসন্নবাবু ও আমি তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হইলাম। শ্রীযুত হরপ্রসন্ন তখন ঢাকা কালেক্টরীতে পেস্কারী করিতেন।

ঢাকা হইতে প্রায় প্রতি শনিবারেই হরপ্রসন্নবাবু নাগমহাশয়কে দেখিতে আসিতেন। বর্ষাকালে পূর্বাঞ্চল জলপ্লাবিত হয়; সেই সময় শনিবার আসিলেই নাগমহাশয় একখানি নৌকা লইয়া নারায়ণগঞ্জে শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণজীউর বাটীর নিকট তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতেন এবং তিনি ট্রেণযোগে নারায়ণগঞ্জে

পৌঁছিলে তাঁহাকে নৌকায় তুলিয়া নিজে বাহিয়া বাটী লইয়া আসিতেন। ক্রমে হরপ্রসন্নবাবু উহাতে আপত্তি করিতে লাগিলেন। অবশেষে একদিন তিনি নৌকায় উঠিতে একেবারে অস্বীকার করিলে স্থির হইল একটি বালক নিযুক্ত করা হইবে। সে-ই প্রতি শনিবার তাঁহাকে দেওভোগে লইয়া আসিত এবং সোমবার নারায়ণগঞ্জে পুনরায় পৌঁছাইয়া দিত। তাহার পর হরপ্রসন্নবাবু নারায়ণগঞ্জে বদলি হন; সে সময় কয়েক মাস তিনি দেওভোগেই বাস করিয়াছিলেন। কিছু পরে আবার তিনি ঢাকায় বদলি হন। ঢাকা হইতে তিনি পূর্বের ন্যায় সর্বদাই দেওভোগে আসিতেন।

কোন কারণে এক সময় শ্রীযুত হরপ্রসন্নের মস্তিষ্ক ঈষৎ চঞ্চল হইয়াছিল, সে সময় তিনি ছুটি লইতে বাধ্য হন। তাঁহার গৃহিণী উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া নাগমহাশয়ের নিকট আগমন করেন। নাগমহাশয় ভক্তদম্পতীকে অভয় দিবার কিছু পরেই শ্রীযুত হরপ্রসন্নের পীড়া নির্মূল হইয়া যায়।

দেহত্যাগ করিবার দুই-তিন দিন পূর্বে নাগমহাশয় হরপ্রসন্ন-বাবুকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, পরমহংসদেব সত্য সত্যই ভগবানের অবতার হয়ে এসেছিলেন।" ভক্তগণের মধ্যে হরপ্রসন্নবাবুই নাগমহাশয়ের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম। তিনি বলিতেন, "হরপ্রসন্নের যেমন বীরভাব, তেমনি ভক্তি।" পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দও ইঁহার ভক্তিভাবে বিমোহিত। নাগমহাশয়ের আদর্শ জীবন ইঁহাতে যেমন প্রতিফলিত, এমন আর কোথাও নয়। ইঁহাকে দেখিলে এবং ইঁহার মুখে 'কৃপা কৃপা নিজগুণে কৃপা'—এই কথাগুলি শুনিলে নাগমহাশয়কে মনে পড়ে। ইঁহার দীনতা, ভক্তিভাব,

প্রেমোচ্ছ্বাস, সেবা প্রভৃতি নাগমহাশয়কে স্মরণ করাইয়া দেয়। হরপ্রসন্নবাবু শিশুকাল হইতেই দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ। ইঁহার রচিত অনেকগুলি সঙ্গীত আছে, ভাবাবেশে কখন কখন তিনি সেগুলি গান করেন।

একদিন নাগমহাশয়ের শরীর বিশেষ অসুস্থ হইয়াছিল। সে দিন হরপ্রসন্নবাবু উপস্থিত হইলে, নাগমহাশয় নিজ অসুখ গ্রাহ্য না করিয়া বাজার হইতে বাছিয়া বাছিয়া চিংড়ি মাছ কিনিয়া আনিলেন। হরপ্রসন্নবাবুও মর্মে ব্যথিত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—সে মাছ তিনি মুখে দিবেন না। মাতাঠাকুরাণী নাগমহাশয়কে সে কথা বলিলে তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া আসিয়া হরপ্রসন্নবাবুকে নিজহাতে মাছ খাওয়াইয়া দিতে দিতে বলিতে লাগিলেন, "এতে কোন দোষ হবে না।"

নাগমহাশয় লোকান্তরিত হইবার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে হরপ্রসন্নবাবু দেওভোগ ত্যাগ করিয়া যান। প্রাণধারণ করিয়া নাগমহাশয়কে অন্তিম বিদায় দিবার শক্তি তাঁহার ছিল না।

জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া হরপ্রসন্নবাবু ঢাকায় নারিন্দা নামক পল্লীতে বাস করিয়াছেন। মধ্যে উৎকল প্রদেশে কিছু দিন কর্ম করিয়াছিলেন।

শ্রীযুত নটবর মুখোপাধ্যায় নাগমহাশয়ের শেষজীবনে তাঁহার সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার নিবাস দেওভোগে, সেজন্য তিনি সর্বদাই নাগমহাশয়ের কাছে থাকিবার সুবিধা পাইতেন। নটবরের প্রথম জীবন উচ্ছৃঙ্খল হইলেও তাঁহাতে ভক্তির বীজ ছিল। নাগমহাশয়কে অবতার বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। নাগমহাশয়ের

পিতৃশ্রাদ্ধে বসতবাটী বন্ধক দেওয়া হয়। মাতাঠাকুরাণী নটবরপ্রমুখ ভক্তদের সাহায্যে বহু আয়াসে তাহার উদ্ধারসাধন করেন। নটবরের যত্নে নাগমহাশয়ের সমাধির উপর একখানি খড়ের ঘর নির্মিত হইয়াছে। তাহাতে নাগমহাশয়ের ব্যবহৃত যাবতীয় দ্রব্যাদি রক্ষিত এবং ঘরের মেজেতে তাঁহার ভস্মাদি প্রোথিত আছে। বেলুড়মঠের অনুকরণে নটবর এখানে নাগমহাশয়ের ভোগরাগ পূজা প্রচলিত করিয়াছেন। তিনি যাহা সৎ বলিয়া বুঝেন তাহার জন্য আপনার যথাসর্বস্ব দিতে এবং কার্যে পরিণত করিতে কদাচ কুণ্ঠিত নহেন।

নটবর একবার একখানি নাটক প্রণয়ন করেন। ভক্তের জন্য ভগবানের নরদেহ ধারণ এবং অধম পতিতগণের উদ্ধারসাধন এই নাটকের বর্ণিত বিষয়। দেওভোগ গ্রামে নাটকখানি অভিনীত হইয়াছিল এবং নাগমহাশয় সে অভিনয় দর্শন করিয়াছিলেন। নটবর এই নাটকে নাগমহাশয়ের অপার দয়া ও অমানুষিক দৈন্য অঙ্কিত করেন।

নাগমহাশয় তাঁহাকে কিছু কিছু শাস্ত্রগ্রন্থাদি পড়িতে উপদেশ দেন। গুরুর কৃপায় তাহার মর্মার্থভেদে নটবরের অলৌকিক প্রতিভা দেখা যায়। কিন্তু নাগমহাশয় ভিন্ন তিনি অন্য কিছুই মানেন না। তিনি মধ্যে মধ্যে চাকরী করেন, কিন্তু অধিকাংশ সময়ই ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে অবস্থান করেন। তিনি বেশীর ভাগ দেওভোগেই থাকেন। মাতাঠাকুরাণী তাঁহার মত না লইয়া কোন কার্যই করেন না। নটবর সর্বদা তাঁহার তত্ত্বাবধান করেন। তাঁহারই যত্নে ও সঙ্গে মাতাঠাকুরাণী শ্রীবৃন্দাবন, কাশীধাম প্রভৃতি দর্শন করিয়াছেন। মায়ের জন্য নটবর জীবনদানেও কাতর

নহেন। নাগমহাশয়ের ভক্তগণ তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর। নটবর কখন কখন কলিকাতায় আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তগণের পদধূলি লইয়া যান, কিন্তু সুখে-দুঃখে, জীবনে-মরণে একমাত্র নাগ-মহাশয়ই তাঁহার অবলম্বন। যিনি নাগমহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনি অবশ্যই পূজনীয়।

নাগমহাশয়ের আর এক ভক্ত শ্রীযুত অন্নদা ঠাকুর। তিনিও শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত-সমাজে সুপরিচিত। তিনি লেখাপড়া বিশেষ জানিতেন না, কিন্তু ভক্তি-বিশ্বাসের বীর ছিলেন। মুন্সীগঞ্জের নিকট কোন পল্লীগ্রামে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। অন্নদাবাবু সুযোগ পাইলেই নাগমহাশয়ের নিকট আসিতেন, বাটীর কাহারও বারণ মানিতেন না। তাঁহার মনে যখন যে ভাবের উদয় হইত, তাহা কার্যে পরিণত না হওয়া অবধি তিনি সুস্থ হইয়া বসিতে পারিতেন না। কর্মে তাঁহার কখন ক্লান্তি দেখি নাই। তিনি পরহিতে প্রাণদানেও পরাঙ্মুখ হইতেন না। নাগমহাশয় তাঁহার অদম্য উদ্যম, অজেয় সাহস, অকপট ভক্তি এবং সরল বিশ্বাসের শতমুখে প্রশংসা করিতেন। এই 'খ্যাপাটে বামুনের' উপর তাঁহার অপার কৃপা ছিল।

হরপ্রসন্নবাবু যখন ঢাকায় থাকিতেন, শ্রীযুত অন্নদা তাঁহার বাসায় কিছুদিন ছিলেন। সেখানে এক ডেপুটি ছিলেন, তাঁহার সহিত অন্নদাবাবুর পরিচয় ছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে ডেপুটির বাসায় বেড়াইতে যাইতেন। সেই সময় আমেরিকা হইতে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের বিজয়দুন্দুভি ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত আলোড়িত করিয়া ধ্বনিত হইতেছে। স্বামীজি-সম্বন্ধে অনেক কথা

অন্নদাবাবু নাগমহাশয়ের কাছে শুনিয়াছিলেন। একদিন তিনি ডেপুটির বাসায় উপস্থিত হইলে স্বামী বিবেকানন্দের কথা উঠিল। ডেপুটি স্বামীজির উপর অযথা কটাক্ষ করিতে লাগিলেন। অন্নদাবাবু স্থির স্বরে বলিলেন, "তুমি ডেপুটি হইয়াছ বলিয়া মনে করিও না, তোমার কথার প্রতিবাদ করিব না। সিদ্ধ মহাত্মা নাগ-মহাশয় শতমুখে যাঁহাকে প্রশংসা করেন, যিনি তপস্যা ও বিদ্যাবলে আমেরিকায় তুমুল আন্দোলন তুলিয়াছেন, যাঁহার গৌরবে ভারতবর্ষ গৌরবান্বিত, অযথা তুমি কেন তাঁহার নিন্দা করিয়া পাপগ্রস্ত হইতেছ?" কোন ফল হইল না, ডেপুটী পুনরায় কটাক্ষ করিতে লাগিলেন। তখন অন্নদাবাবু তাঁহার সম্মুখীন হইয়া দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "One word more against Swamiji and you are done for"—স্বামীজির বিরুদ্ধে আর একটি কথা তোমার মুখ দিয়া বাহির হইলেই তোমাকে খুন করিব। তাঁহার উগ্রমূর্তি দেখিয়া ডেপুটির মুখ বিবর্ণ হইল। তা তা করিতে করিতে বলিলেন, "তা ভাই, ঠাট্টা করলুম বলে কি রাগ করতে হয়?" অন্নদাবাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সেখান হইতে উঠিয়া আসিলেন, ইহ জীবনে আর সে ডেপুটির মুখ দেখেন নাই।

নাগমহাশয়ের যখন প্রায় অন্তিমকাল উপস্থিত, অন্নদাবাবু ব্যাকুল হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণভক্ত-জননী শ্রীশ্রীমায়ের নিকট তাঁহার জীবন ভিক্ষা করিবার জন্য গমন করেন। শ্রীশ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে ছিলেন। তারকেশ্বর হইতে অন্নদাবাবু পদব্রজে জয়রামবাটীতে গেলেন এবং পদব্রজে পুনরায় তারকেশ্বরে আসিয়া তথা হইতে কলিকাতায় গিয়া গিরিশবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাহার পর

যখন তিনি দেওভোগে ফিরিয়া আসেন, তখন নাগমহাশয় আর ইহলোকে নাই। নাগমহাশয়ের চরম সময়ে তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না বলিয়া অন্নদাবাবু অবশিষ্ট জীবন আক্ষেপ করিতেন।

অন্নদাবাবু তাঁহার এক কনিষ্ঠ ভাই-সম্বন্ধে বড় সন্তপ্তচিত্ত ছিলেন। ভাইটি ঠিক জ্যেষ্ঠের বিপরীত। অন্নদাবাবুর আচার-নিষ্ঠা বড় ছিল না এবং লেখাপড়া বিশেষ জানিতেন না। ভাই পরম আচারী ও বেদবিৎ, কিন্তু একেবারে ভক্তিভাববিহীন। অন্নদাবাবু সর্বদা বলিতেন, "আপনারা আশীর্বাদ করুন যাহাতে ইহার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-পদে ভক্তি হয়।" নাগমহাশয়ের শেষ শয্যায় এই ভাইটি তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। একরাত্রে তাঁহাতে ও আমাতে ঈশোপনিষৎ পাঠ করিয়া নাগমহাশয়কে শুনাই। এই ভাই একবার বেলুড় মঠেও গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অহংবুদ্ধির জন্য কোথাও সাধুকৃপা লাভ করিতে পারেন নাই। অন্নদাবাবু বলিতেন, "তাঁহার কনিষ্ঠ জীবনে বহু দুঃখ পাইবে।" কথাও সত্য হইয়াছিল।

নাগমহাশয় অপ্রকট হইবার নয় বৎসর পরে অন্নদাবাবু আমাশয় পীড়ায় দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুসময়ে তিনি নাগমহাশয়ের ভক্তগণকে দেখিতে চান। সংবাদ পাইয়াই শ্রীযুত হরপ্রসন্ন তাঁহার নিকট গমন করেন। তাঁহাকে দেখিয়া অন্নদাবাবু পরমাহ্লাদে বলিলেন, "দাদা, শরীর যাইতে আর বিলম্ব নাই। আশীর্বাদ কর যেন দেহ বদলাইয়া শীঘ্রই আবার ঠাকুরের কার্যে আসিতে পারি।" এই বলিয়া গদগদকণ্ঠে শ্রীরামকৃষ্ণের ও নাগমহাশয়ের নাম করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁহার প্রাণবায়ু স্থির হইল।

হরপ্রসন্নের উড়িষ্যায় চাকুরীর প্রধান উপলক্ষ্য অন্নদাবাবু। নাগমহাশয়ের ভক্তগণের জন্য তিনি প্রাণ দিতে পারিতেন।

শ্রীমতী হরকামিনীর স্বামী শ্রীযুত কৈলাসচন্দ্র দাস সহধর্মিণীর ন্যায় জীবনের শুভাশুভ সকল বিষয়ের ভার নাগমহাশয়কে অর্পণ করিয়াছেন। কৈলাসবাবু নাগমহাশয়ের সংসারের এক প্রকার অভিভাবকস্বরূপ ছিলেন। হাটবাজার করা, ঘরদ্বার মেরামত করা, সময় অসময়ে ধার কর্জ করিয়া সংসার চালান প্রভৃতি কার্যে শ্রীযুত কৈলাস মাতাঠাকুরাণীর প্রধান সহায়। তিনি বীরভাবের সাধক, মধ্যে মধ্যে 'কারণ' ব্যবহার করিতেন। সময় সময় তাহার মাত্রাও ছাড়াইয়া উঠিত। তাঁহাকে নিবৃত্তিপথে আনিবার জন্য নাগমহাশয়ের বিশেষ যত্ন ছিল। কৈলাসবাবুকে পানদোষ হইতে নিরস্ত করিবার জন্য নাগমহাশয় একদিন নিজে কারণ কিনিয়া আনিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ পান করান; সেই দিন হইতে কৈলাসবাবু আর জীবনে কারণ স্পর্শ করেন নাই।

নাগমহাশয় কাহারও সেবা লইতেন না, কিন্তু কৈলাসবাবু-সম্বন্ধে কোন কথা চলিত না। নাগমহাশয়কে ধমক দিয়া তিনি আপনার ইচ্ছানুরূপ আহারাদি করাইতেন। তাঁহাকে ভয় করিত না দেওভোগে এমন লোক ছিল না।

সর্বপ্রকার কপটাচারের উপর কৈলাসবাবু একেবারে খড়্গহস্ত; বলেন, "যখন অন্তর্যামী ভগবান সবই দেখিতেছেন, তখন আবার কাহাকে লুকাইয়া চলিব?"

যে নাগমহাশয় আব্রহ্মস্তম্ব সমগ্র জগতের সঙ্গে সেব্যসেবকভাবে

ব্যবহার করিতেন, তাঁহার সঙ্গে কৈলাসবাবুর সেই ভাব ছিল। যতদিন নাগমহাশয় জীবিত ছিলেন, তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালন করা কৈলাসবাবুর একমাত্র ব্রত ছিল।

শ্রীযুক্ত পার্বতীচরণ মিত্র সম্পর্কে নাগমহাশয়ের জামাতা। মুন্সীগঞ্জের উকীলবাবু রাজকুমার নাগ সম্পর্কে নাগমহাশয়ের জ্ঞাতি ভাই; তাঁহার কন্যা শ্রীমতী বিনোদিনী দেবীকে পার্বতীবাবু বিবাহ করেন। এই দম্পতিযুগল নাগমহাশয়ের কৃপায় ধর্ম-বিষয়ে খুব উন্নতিলাভ করিয়াছেন। ইঁহাদিগকে নাগমহাশয় 'লক্ষ্মী-নারায়ণ' বলিয়া নির্দেশ করিতেন। এই উভয় ভক্তই নাগ-মহাশয়ের ঈশ্বরত্ব নির্দেশ করিয়া থাকেন। শুনা যায়, ভগিনী বিনোদিনী নাগমহাশয়ের কৃপায় অনেক রকম অলৌকিক দর্শন লাভও করিয়াছেন। পার্বতীবাবু এখনও মাতাঠাকুরাণীকে মাসে মাসে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন।

নাগমহাশয়ের শেষজীবনে আমরা সর্বদা শ্রীযুক্ত রাজকুমার-নাগকে তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে দেখিয়াছি। ইদানীং তিনি নাগমহাশয়কেই জীবনের আদর্শ জানিয়া ধর্মপথে অগ্রসর হইতেছেন। ইনি নাগমহাশয়-সম্বন্ধে ইদানীং অনেক অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করিয়া থাকেন। তাহার মধ্যে একটি ঘটনা এই যে, নাগমহাশয়ের বাড়ীতে যে দিন গঙ্গার উৎস উঠে, সেই দিন নাকি দুই একজন ভক্ত কালীঘাটের মা কালীকে তথায় প্রকট দেখিতে পাইয়াছিলেন; যেন সমস্ত কালীঘাট তথায় প্রতিবিম্বিত হইয়া ভক্তগণকে কালীঘাটের ভাবরাজ্যে বিচরণ করাইয়াছিল। রাজকুমারবাবু লেখককে ইহাও বলিয়াছেন যে, দীনদয়ালের

মৃত্যুকালে নাগমহাশয় নাকি বলিয়াছিলেন, "যদি বাবার মৃত্যু-যন্ত্রণা চক্ষে দেখিতে হয় তবে এ জীবনে ধর্ম কর্ম করাই বৃথা হইল—হে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ, বাবার এই সময় সদ্গতি করিয়া তোমার পতিতপাবন নাম সার্থক কর" ইত্যাদি।

পার্বতীচরণ বড় নির্জনতাপ্রিয়; ধর্মসম্বন্ধে কাহারও সহিত তর্কবিতর্ক করেন না; নাগমহাশয়কে মহাপুরুষ জানিয়া সর্বথা তাঁহার চরণে আত্মবিক্রয় করিয়াছিলেন। আমরা যখন নানা গণ্ডগোল করিতাম, পার্বতীবাবু নিঃসঙ্গে বসিয়া আপনার ইষ্টচিন্তা করিতেন। নাগমহাশয়কে তিনি কখন কোন প্রার্থনা জানান নাই, তাঁহার বিশ্বাস ছিল নাগমহাশয় সর্বজ্ঞ, তাঁহার পক্ষে যাহা প্রয়োজন নাগমহাশয় নিজেই তাহার বিধান করিবেন। নাগ-মহাশয়ের অন্তিমদিনে পার্বতীবাবু দেওভোগে উপস্থিত ছিলেন। নাগমহাশয়ের স্মৃতিরক্ষাকল্পে তিনি সর্বদা মুক্তহস্ত। মাতাঠাকুরাণীর উপর তাঁহার অচলা ভক্তি।

নাগমহাশয়ের তদানীন্তন প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু ভূঁইয়া প্রতিদিন নাগমহাশয়ের বাটী আসিয়া ভাগবত-পুরাণাদি পাঠ ও ভক্তসঙ্গে সংকীর্তন করিতেন। তাঁহার ভক্তি ও দীনতার প্রশংসা নাগমহাশয়ের মুখে সর্বদা শুনা যাইত। জগদ্বন্ধুবাবুকে তিনি যথেষ্ট কৃপা করিতেন, প্রতিদিন নিজে লণ্ঠন ধরিয়া তাঁহাকে বাটী রাখিয়া আসিতেন।

জগদ্বন্ধুবাবু এখন দেওভোগ ছাড়িয়া স্থানান্তরে বাস করিতেছেন। মধ্যে মধ্যে দেওভোগে আসিয়া নাগমহাশয়ের সমাধি দর্শন করিয়া যান।

নাগমহাশয়ের বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায় দেওভোগের সর্বাপেক্ষা বর্ষিষ্ঠ লোক। কামিনীকুমারবাবু গম্ভীরাত্মা, নাগমহাশয়ের উপর তাঁহার অন্তর্নিহিত ভক্তিভাব মুখে কখন প্রকাশ হইত না, কেবল একদিন মাত্র তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, "নাগমহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষের জন্মে তাঁহাদের দেওভোগ গ্রাম ধন্য হইয়াছে।"

কামিনীবাবুর পিতা ও নাগমহাশয়ের পিতার মধ্যে বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল, সেই সূত্রে পুত্রদ্বয়েরও সৌহৃদ্য হয়।

কামিনীবাবু নাগমহাশয়ের বাড়ী আসিয়া বড় একটা কথাবার্তা কহিতেন না। নীরবে বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতেন আর নাগমহাশয়কে দেখিতেন।

নাগমহাশয়ের ভক্ত বলিয়া কামিনীবাবু ও তাঁহার পিতা আমাদিগকেও বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া আহার করাইতেন।

একদিন কামিনীবাবুকে নাগমহাশয়ের নিকট বসিয়া 'নীল আকাশে ধীর বাতাসে কোথা যাও পাখী'—এই গানটি গাহিতে শুনি। গায়কের বিভোর ভাব এখনও আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত রহিয়াছে; তাঁহার কণ্ঠস্বর এখনও আমার কর্ণে বাজিতেছে। নাগমহাশয় ভাবময় সঙ্গীত শুনিলে একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন। একদিন তাঁহার একটি ভক্ত 'নবীনা নীরদনীলা নগনা কে নিতম্বিনী'—গানটি গাহিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে নাগমহাশয়ের ভাবসমাধি হইল। সমাধিভঙ্গের পর তামাক সাজিতে সাজিতে তিনি ভক্তটিকে বলিলেন, "মাকে দেখ্‌লাম,

আপনার গান শুনিতে এই ঘরে দাঁড়াইয়া আছেন। এই জন্মেই আপনি মায়ের কৃপালাভ করিবেন।”

আর একদিন এই শেষোক্ত ভক্তটি নাগমহাশয়ের নিকটে বসিয়া একটি শ্যামাবিষয়ক গান গাহিতেছিলেন। নাগমহাশয় ‘জয় মা আনন্দময়ী’ বলিতে বলিতে তুড়ি দিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি কেবলই বলিতে লাগিলেন, ‘হেরিলে ও মুখ দূরে যায় দুখ শ্যামা মার রে।’ ভক্তটির মনে হইল তিনি মায়ের মূর্তি প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন। তাহার পর নাগমহাশয় বার বার ভাবাবেশে বলিতে লাগিলেন—‘প্রসাদ বলে, দুর্গা বলে যাত্রা করে বসে আছি।’ ভক্ত এই সকল কথা মাতাঠাকুরাণীকে বলিলে মা বলিলেন, “বাবা, সাধন-ভজনের কথা কি বলিতেছ? ইনি ইচ্ছা করিয়া যে দেবদেবীকে ডাকেন, তিনি তৎক্ষণাৎ ইঁহাকে দর্শন দেন। ইনি এই কথা নিজে আমায় কতদিন বলিয়াছেন।”

বলিতে গেলে একপ্রকার দেওভোগের আবালবৃদ্ধবনিতা নাগমহাশয়ের ভক্ত ছিল। তাহারা সর্বদাই তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সত্যগোপাল ঠাকুরের সহোদর শ্রীযুক্ত মহিমাচরণ ঠাকুর ও নকড়ি দত্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নাগমহাশয়ের পুরোহিতপুত্র শ্রীযুক্ত অশ্বিনী চক্রবর্তী নাগমহাশয়ের নিকট বসিয়া শাস্ত্রালাপে ভক্তিপ্রসঙ্গে কোন কোন দিন রাত কাটাইতেন। এই পুরোহিতপুত্রের সঙ্কীর্তনে বড় অনুরাগ ছিল। কীর্তন করিতে করিতে তিনি উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন। ইনিই এক্ষণে সমাধির উপর স্থাপিত নাগমহাশয়ের ছবি নিত্য পূজা করেন এবং ভোগরাগ প্রভৃতি দিয়া থাকেন।

প্রতিবাসী শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী নাগমহাশয়ের সর্বপ্রথম ভক্ত। নাগমহাশয়ের ভক্তগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার সহিত প্রথম পরিচয়ের জন্য গোপালের কাছে ঋণী। ইনি কোন সময়ে নারায়ণগঞ্জে পাটের ব্যবসায় করিতেন, পরে কার্য হইতে অবসর লইয়া সাধনভজনে মনোনিবেশ করেন। প্রথমে এক স্ত্রীগুরুর নিকট ইঁহার দীক্ষা হয়। দীক্ষা লইয়া ইনি মধুরভাব সাধন করেন। এই সাধনার ফলে তাঁহার এক অপূর্ব আকর্ষণী শক্তি জন্মিয়াছিল। ভক্তসমাজে ইনি সত্যগোপাল নামে পরিচিত। সত্যগোপাল মৃদঙ্গে সিদ্ধহস্ত এবং অতি সুকণ্ঠ ছিলেন। তিনি কীর্তন করিয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। তাঁহার কীর্তনের এমনি এক মোহিনী শক্তি ছিল যে, পাষাণ-হৃদয়ও বিগলিত হইত। সত্যগোপাল প্রায় তিন বৎসর একাদিক্রমে নাগমহাশয়ের সঙ্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্রবে আসিয়াই সত্যগোপালের জীবন পরিবর্তিত হয়, তিনি বৈষ্ণবতন্ত্রের বামাচার-সাধন ত্যাগ করিয়া ভক্তিমার্গের পথিক হন। তাঁহার উপর নাগমহাশয়ের বিশেষ স্নেহ ছিল। কখন কখন তাঁহাকে নিবিড় জঙ্গলের ভিতর লইয়া গিয়া তিনি সাধন-ভজন করিতেন। নাগমহাশয় বলিতেন, 'এঁর খুব বিশ্বাস, খুব অনুরাগ আছে, কিন্তু ভোগবাসনার একান্ত ক্ষয় হয় নাই।' সত্যগোপাল নাগমহাশয়কে মনে মনে গুরু বলিয়া মানিতেন, কিন্তু নাগমহাশয় গুরু সম্বোধন সহ্য করিতে পারিতেন না বলিয়া মুখে কিছু বলিতেন না। নাগমহাশয়ের সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, তিনি মূর্তিমান বেদ ও আকাশের ন্যায় মহিমান্বিত। এজন্য তিনি সর্বদা 'শ্রীগুরু বেদাকাশের জয়' বলিয়া

নাগমহাশয়ের জয় ঘোষণা করিতেন। নাগমহাশয়ের কৃপায় তিনি ভক্তসমাজে বহু প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। নারায়ণগঞ্জের নিকট ধর্মগঞ্জ পল্লীতে তিনি আশ্রম স্থাপন করিয়া জীবনের শেষ তিন বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অনেক শিষ্য হইয়াছিল। কিছু দিন হইল পৃষ্ঠব্রণে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। একবার তিনি নাগমহাশয়কে কয়েকটি সুপক্ক আম উপহার পাঠাইয়া দেন। নাগমহাশয় তখন বাটী ছিলেন না। যে লোকটি আম আনিয়াছিল মাতাঠাকুরাণী তাহাকে উহা ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ জিদ করেন, কিন্তু লোকটি তাঁহার কথা না শুনিয়া ঘরের দ্বারের পাশে আম কয়েকটি রাখিয়া চলিয়া যায়। গৃহে ফিরিয়া নাগমহাশয় সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিলেন। তখন বর্ষাকাল, নৌকা ব্যতীত এক বাটী হইতে অন্য বাটীতে যাওয়া যায় না। কিন্তু সেদিন নৌকা পাওয়া গেল না। নাগমহাশয় সাঁতার দিয়া সত্যগোপালের বাটী গিয়া আম কয়টি বিনয় করিয়া ফিরাইয়া দিয়া আসিলেন।

মহাসমাধি

১৩০৬ সালের শরৎকালে নাগমহাশয় আর কলিকাতায় আসিতে পারিলেন না। বিবিধ কার্যবশতঃ আমিও সে বৎসরে দেওভোগে যাইতে পারি নাই। আশ্বিন কার্তিক দুই মাস কাটিয়া গেল. অগ্রহায়ণের শেষভাগে আমি মাতাঠাকুরাণীর একখানি আহ্বান-টেলিগ্রাম পাইলাম। সেদিন শনিবার, বেলা দ্বিপ্রহরে টেলিগ্রাম আসে। পরদিন রবিবার রামকৃষ্ণ মিশন সভায় 'বেদের ধর্ম' সম্বন্ধে আমার একটি প্রবন্ধ পড়িবার কথা ছিল। সাধারণের কার্য ছাড়িয়া কিরূপে যাই। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া ভাবিতেছি, এমন সময় স্বামী অদ্ভুতানন্দ আমার বাসায় আসিলেন। টেলিগ্রাম দেখিয়া তিনি বলিলেন, "বেদের বক্তৃতা দিতে জীবনে অনেক সময় পাইবে, কিন্তু নাগমহাশয়ের শরীর চলিয়া গেলে আর তোমার ভাগ্যে সে দেবদুর্লভ মহাপুরুষের দর্শন ঘটিবে না।" আমি সেই দিনই দেওভোগে যাত্রা করিব স্থির করিলাম।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত শ্রীযুত হরমোহন মিত্র কিছু অর্থসাহায্য করিলেন। তদ্দ্বারা নাগমহাশয়ের জন্য পানফলের পালো ও বেদানা কিনিয়া লইয়া আমি সেই রাত্রেই গাড়ীতে উঠিলাম। পরদিন রবিবার সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমি দেওভোগে উপস্থিত হই।

বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, তিনি পূর্বদিকের ঘরের বারান্দার দক্ষিণভাগে একখানি ছেঁড়া কাঁথার উপর পড়িয়া রহিয়াছেন। অথচ তাঁহার ঘরে লেপ তোশকের অভাব ছিল

না। শীতকাল, রাত্রে মাঠের কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতে থাকে, সে সময় কেবল কয়েকখানি শতচ্ছিদ্র দরমাঘেরা বারান্দায় এইভাবে রাত্রিযাপন করা রোগীর কথা ত দূরে, সুস্থ শরীরেই যে তাহা কি কষ্টকর তাহা অনুমান করিতে কল্পনার সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া আমি মায়ের মুখপানে চাহিলাম, তিনি চুপে চুপে আমায় বলিলেন, "বাবা! যে দিন হইতে ইনি উত্থানশক্তিহীন হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছেন, সেই দিন হইতে আর ঘরে প্রবেশ করেন নাই, বারান্দায় এইভাবে পড়িয়া আছেন। পূজার পূর্ব হইতে শূলবেদনা বাড়িয়াছিল, তাহার উপর আবার আমাশয়রোগ আক্রমণ করিয়াছে। রোগের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখিয়া ইঁহাকে সম্মত করাইয়া তোমায় তার করিয়াছিলাম।"

মাতাঠাকুরাণীর মুখে আমার আগমন-সংবাদ পাইয়া নাগমহাশয় বলিলেন, "আমার শেষ বাসনাও ঠাকুরের কৃপায় পূর্ণ হইল।" আমাকে দেখিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন; আমার অশ্রু দেখিয়া আমায় আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিলেন, "আপনি যখন আসিয়া পড়িয়াছেন, তখন সকলই মঙ্গল হইবে।" তাহার পর বলিলেন, "হায় হায়, এ দেহ দিয়া আর আপনার সেবা করা হইল না। আমি সেবাপরাধী হইলাম।" মাতাঠাকুরাণীকে আমার জন্য দুগ্ধ মাখন প্রভৃতি সংগ্রহ করিবার আদেশ দিলেন। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে স্থানান্তরে গেলাম।

অসুখের কথা নাগমহাশয় নিজে কখনও মুখে আনিতেন না। একবারমাত্র মাকে ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন, "আমার প্রারব্ধ কর্মের

ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে, অতি অল্পই বাকি।" ভাদ্রমাসের শেষ হইতে তাঁহার শরীর অতিশয় অসুস্থ হয়। দিবসে দুই-চার গ্রাসমাত্র অন্ন খাইতেন, আর রাত্রে উপবাসী থাকিতেন। দেহ ক্রমে কঙ্কালসার হইল। সে জীবন্ত কঙ্কাল দেখিয়া মাতাঠাকুরাণীকে কখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে দেখিলে নাগমহাশয় বলিতেন, "ছাই এ হাড়-মাঁসের খাঁচার জন্য তুমি ভাবিত হইও না।" বহু সাধ্যসাধনা করিয়াও মা তাঁহাকে কোনরূপ ঔষধ খাওয়াইতে পারেন নাই। ঔষধের কথা বলিলে বলিতেন, "ঠাকুর বলিতেন—হিঞ্চে শাক শাকের মধ্যে নয়, এতে কোন অনিষ্ট হবে না।" পথ্যৌষধিরূপে তাহারই রস একটু একটু পান করিতেন।

তাঁহার চরম দিবসের ত্রয়োদশ দিন পূর্বে আমি দেওভোগে উপস্থিত হই। কোন মতেই তাঁহাকে ঘরে উঠাইয়া শোয়াইতে পারিলাম না। মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে প্রাণান্তিক যন্ত্রণা অনুভব করিতে দেখিয়াছি, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও কাতর হইতে দেখি নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ ভিন্ন অসুখের কি অন্য কোন কথা তাঁহার মুখে ছিল না।

একাদিক্রমে এই ত্রয়োদশ দিবস আমি তাঁহার কাছে কাছেই থাকিতাম। কখন তাঁহাকে স্তব পাঠ করিয়া শুনাইতাম, কখন তাঁহার কাছে বসিয়া গীতা, ভাগবত, উপনিষদ্ প্রভৃতি পড়িতাম, কখন শ্যামাবিষয়ক গীত গাহিতাম, আবার কখন কীর্তন করিতাম। শুনিতে শুনিতে তিনি মধ্যে মধ্যে সমাধিস্থ হইতেন। সমাধিতে কখন কখন একঘণ্টা দেড়ঘণ্টা কাটিয়া যাইত। সমাধিভঙ্গের পর তিনি সময় সময় সুপ্তোত্থিত শিশুর ন্যায় 'মা মা' বলিয়া কাঁদিয়া

উঠিতেন, আর তাঁহার দেহে প্রেমের অষ্টসাত্ত্বিক-বিকার-লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিত। কখন কখন গভীরসমাধি-ভঙ্গের পর বলিতেন, "সচ্চিদানন্দ অখণ্ড চৈতন্য, অখণ্ড চৈতন্য।"

নাগমহাশয়ের পীড়া বাড়িলে তাঁহার ভগ্নী সারদামণি, তাঁহার শাশুড়ী, শালী, কৈলাসবাবু ও কৈলাসবাবুর জামাতা আদিত্যবাবু তাঁহার সেবা করিবার জন্য দেওভোগে আসিয়াছিলেন। কিন্তু নাগমহাশয় কাহাকেও সেবা করিতে দিলেন না। মা কায়মনে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

আমি দেওভোগে গমন করিলে নাগমহাশয় আমার হাতে পথ্যাদি লইতে লাগিলেন। কলিকাতা হইতে পানফলের পালো আনিবার সময় আমার মনে হইয়াছিল, তিনি হয়ত গ্রহণ করিবেন না; কিন্তু আমি নিজহস্তে প্রস্তুত করিয়া খাওয়াইয়া দিতে তিনি কোন আপত্তি করিলেন না।

শ্রীযুক্ত নটবর, হরপ্রসন্ন, পার্বতীচরণ, অন্নদা প্রভৃতি প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন, কোন কোন দিন বা রাত্রেও থাকিতেন। এতদ্ভিন্ন নারায়ণগঞ্জ হইতে অনেক ভদ্রলোক ও রাজকর্মচারী তাঁহার তত্ত্ব লইতে আসিতেন। তাঁহাদিগকে বিষণ্ণ দেখিলে নাগমহাশয় বলিতেন, "হায়, হায়! অনর্থক কষ্ট করিয়া কেন এই হাড়মাংসের খাঁচা দেখিতে আসিয়াছেন, এ দেহ আর বেশীদিন থাকিবে না।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া মাতাঠাকুরাণী আমায় কাঁদিতে কাঁদিতে বলিয়াছিলেন, "ইঁহার জীবনে কখন মুখ দিয়া মিথ্যা কথা বাহির হয় নাই। ইনি যখন বলিতেছেন দেহ আর বেশী দিন থাকিবে না, তখন নিশ্চয়ই এবার মহাযাত্রা করিবেন।"

এই দারুণ দুর্দিনেও নাগমহাশয় গৃহাগত অতিথিগণের আহারাদির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ তত্ত্বাবধান করিতেন। কাহার জন্য কিরূপ খাদ্যসামগ্রীর আয়োজন করিতে হইবে, কাহাকে কোথায় শয়ন করিতে দিতে হইবে, বাজার হইতে কি আনাইতে হইবে, নাগমহাশয় মাতাঠাকুরাণীকে সমস্ত বলিয়া দিতেন। কৈলাসবাবু হাটবাজার করিয়া আনিতেন, আমরা সে দুর্দিনেও রাজভোগ 'ধ্বংস' করিতাম। মৃত্যুর পাঁচ দিন পূর্বে তিনি কৈলাসবাবুকে গোয়ালাবাড়ী পাঠাইয়া আমার জন্য দধিদুগ্ধ আনাইয়াছেন। তিন দিন পূর্বেও আমার প্রিয় ভাঙ্গনমাছ আনাইয়া আমাকে খাওয়াইয়াছেন।

দিবসের অধিকাংশ সময় আমি তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিতাম। তিনি অবিরত বলিতেন, "ভগবান দয়াবান! ভগবান দয়াবান!" তাঁহার যন্ত্রণা দেখিয়া আমার মনে হইত ভগবান নিষ্ঠুর। একদিন তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছি, তিনি যেন আমার মনের কথা বুঝিতে পারিয়া বলিলেন, "ভগবানের অপার করুণায় কদাপি সন্দিহান হইবেন না। আমার এ দেহ দিয়া জগতের আর কি উপকার হইবে? এখন বিছানায় পড়িয়া ত আর আপনাদের সেবাও করিতে পারিলাম না! ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ তাই দয়া করিয়া এই জঘন্য দেহ পঞ্চভূতে মিশাইয়া দিতেছেন।" তাহার পর তিনি ক্ষীণকণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, "দেহ জানে আর দুঃখ জানে, মন তুমি আনন্দে থাক।" আমাকে যখনই বিষণ্ণ দেখিতেন, তিনি বলিতেন, "কি ছাইভস্ম ভাবিতেছেন! এ ছাই হাড়মাঁসের খাঁচার কথা ভাবিবেন না। মায়ের নাম করুন, ঠাকুরের কথা বলুন —এ সময়ে উহাই ভবরোগের একমাত্র মহৌষধি।" আমি মনের

আবেগে গাহিতে লাগিলাম—'আমায় দে মা পাগল করে, আর কাজ নেই মা জ্ঞানবিচারে।' বিভোর হইয়া গাহিতে গাহিতে আমার যেন বাহ্যচৈতন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে শুনিলাম, মাতাঠাকুরাণী আমায় ডাকিতেছেন। তাঁহার দিকে চাহিতে তিনি আমায় দেখাইয়া দিলেন, আমি দেখিলাম—নাগমহাশয় উঠিয়া বসিয়া আছেন—দৃষ্টি স্থির ও নাসাগ্রস্থাপিত, নয়নপ্রান্তে প্রেমধারা। এখন তাঁহাকে ধরিয়া পাশ ফিরাইয়া দিতে হয়; গান শুনিতে শুনিতে তিনি সমাধিস্থ হইয়াছেন, কখন যে উঠিয়া বসিয়াছেন আমি টের পাই নাই। দেখিয়া আমার ভয় হইল। সমাধি শীঘ্রই ভাঙ্গিল; সমাধিশেষে আর তিনি বসিতে পারিলেন না। মাতা-ঠাকুরাণী ও আমি দুইজনে ধরিয়া তাঁহাকে শোয়াইয়া দিলাম। তিনি তখনও বলিতে লাগিলেন, "আমায় দে মা পাগল করে।"

ব্যাধি দিন দিন বাড়িতে লাগিল। আহারও প্রায় বন্ধ হইল, কখন ঝিনুকে করিয়া একটু-আধটু পানফলের পালো খাইতেন। ক্রমে তাঁহার কাছে রাত্রিতে লোক থাকিবার প্রয়োজন হইল, মাতাঠাকুরাণী ও আমি পালা করিয়া তাঁহার কাছে থাকিতাম। আমি প্রায়ই শেষরাত্রে জাগিতাম। কাতর হইয়া কখন তাঁহাকে বলিতাম, "আমাকে কৃপা করিয়া যান। আর কার মুখ চাহিয়া সংসারে থাকিব?" তিনি অভয় দিয়া বলিতেন, "ভয় কি? যখন এসে পড়েছেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ অবশ্যই কৃপা করবেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর কখনও অমঙ্গল হয় না।"

স্বামী সারদানন্দ তখন শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের কার্যোপলক্ষে ঢাকায় ছিলেন। নাগমহাশয়কে তিনি প্রায় নিত্য দেখিতে

আসিতেন এবং তাঁহার সেবাশুশ্রূষা ও চিকিৎসা-সম্বন্ধে অনেক সদুপদেশ দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদ বলিয়া নাগমহাশয় তাঁহাকে কোনরূপ সেবা করিতে দিতেন না। 'শিবসঙ্গে সদা রঙ্গে,' 'মজলো আমার মনভ্রমরা' এবং 'গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়'—এই তিনটি গীত তিনি নাগমহাশয়কে একদিন গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন। শুনিতে শুনিতে নাগমহাশয় সমাধিস্থ হইলেন। স্বামী সারদানন্দের উপদেশে নাগমহাশয়ের কর্ণমূলে কালীনাম উচ্চারণ করিতে করিতে সমাধিভঙ্গ হইল। বেলুড় মঠ হইতে স্বামী সারদানন্দ কতকগুলি হোমিওপ্যাথিক ঔষধ আনাইয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়াছিলেন। হায়, কিছুতেই কিছু হইল না, রোগ উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল।

মহাসমাধিলাভের কিছু পূর্বে নাগমহাশয় কালীপূজা করিবার ইচ্ছা করেন। ৯ই পৌষ শনিবার রাত্রে পূজার দিন স্থির হইল। নানা অভাবসত্ত্বেও মাতাঠাকুরাণী পূজার বিধিমত আয়োজন করিতে লাগিলেন। প্রতিমা ফরমাইশ দেওয়া হইল। ঢাক বায়না করা হইল। কোন কিছুরই ক্রুটী রহিল না।

পূজার রাত্রে শ্রীযুক্ত নটবর ও আমি উপস্থিত ছিলাম। প্রতিমা আনা হইলে স্বামী সারদানন্দ বলিলেন, "নাগমহাশয় ত উঠে মায়ের প্রতিমা দেখতে পারবেন না, প্রতিমাখানি ধরাধরি করে একবার তাঁকে দেখিয়ে নিয়ে আয়, তাহার পর মণ্ডপে বসিয়ে দিবি।" আমরা রক্ষাকালীপ্রতিমা তাঁহার শিয়রদেশে রাখিয়া বলিলাম, "আপনি কালীপূজা করিতে চাহিয়াছিলেন, প্রতিমা আনা হইয়াছে, মা আপনার শিয়রে।" নাগমহাশয় চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন; প্রতিমা-

দর্শন করিয়াই 'মা মা' বলিতে বলিতে তাঁহার গভীর সমাধি হইল। স্বামী সারদানন্দের উপদেশে পূর্বকারমত আমরা আবার তাঁহার কর্ণে কালীনাম উচ্চারণ করিতে লাগিলাম, কিন্তু এই সমাধি ভাঙ্গিল না। নাড়ী নাই, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন পর্যন্ত স্তম্ভিত। মাতা-ঠাকুরাণী কাঁদিয়া বলিলেন, "ইনি বুঝি কালীপূজা উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগকে ছাড়িয়া গেলেন।" আমরাও কাঁদিতে লাগিলাম। স্বামী সারদানন্দ বলিলেন, "আপনারা ভয় পাইবেন না, ইনি এখনি আবার ব্যবহার-জগতে ফিরিয়া আসিবেন।" প্রায় দুই ঘণ্টা অতীত হইলে নাগমহাশয়ের সমাধিভঙ্গ হইল। 'মা আনন্দময়ী, আনন্দময়ী' বলিয়া তিনি বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কালীপূজা হইয়াছে কি?" আমি বলিলাম, "মা সন্ধ্যা হতে আপনার শিয়রে, অনুমতি করেন ত মাকে মণ্ডপে নিয়ে যাই।" তাঁহার সম্মতিক্রমে প্রতিমা মণ্ডপে নীত হইল। ঢাক বাজিতে লাগিল। রাত্রি দশটার সময় পূজা আরম্ভ হইল। নাগমহাশয়ের সম্মতি লইয়া পুরোহিত প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন। মাকে বলির পরিবর্তে চিনির নৈবেদ্য, কারণের পরিবর্তে সিদ্ধি দেওয়া হইল। ষোড়শোপচারে মায়ের পূজা শেষ হইলে পুরোহিত নির্মাল্য আনিয়া নাগমহাশয়ের মস্তকে স্থাপন করিলেন। কিছুক্ষণ তাঁহার ভাবাবেশ হইয়াছিল, কিন্তু সত্বরই সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। স্বামী সারদানন্দ পূজার পূর্বেই ঢাকায় চলিয়া গিয়াছিলেন।

শেষ রাত্রে আমি তাঁহার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া বলিলাম, "আজ আপনার অবস্থা দেখে মনে হয়েছিল—বুঝি আর দেহে ফিরে

আসবেন না।" তিনি ক্ষীণস্বরে বলিলেন, "প্রারব্ধের ক্ষয় না হলে দেহ যাবার নয়।"

রক্ষাকালীপূজায় আমরা একটু আশান্বিত হইয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, মা নিশ্চয়ই তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। নাগমহাশয় বলিলেন, "মা আজ রক্ষাকালীর মূর্তিতে দয়া করে এসেছেন—এ হাড়মাঁসের খাঁচা রক্ষা করতে নয়; যেসকল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এখানে দয়া করে পদধূলি দিতে এসেছেন, তাঁদের আপদে বিপদে রক্ষা করতে এসেছেন। মঙ্গলময়ী মা আপনাদের মঙ্গল করুন।" তাঁহার রক্ষাকালীপূজার অভিপ্রায় তখন আমরা বুঝিলাম। পরদিন শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রসঙ্গ করিতে করিতে তিনি আমায় বলিয়াছিলেন, "দয়াময় শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে আপনাদের ভক্তি-বিশ্বাস হউক। আমি বোকা লোক, তিনি অক্ষম জানিয়া নিজগুণে আমাকে কৃপা করিয়াছেন।" ইহা বলিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ!' বলিতে বলিতে তিনি ঠাকুরকে প্রণাম করিতে লাগিলেন।

পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বাটী বন্ধক রাখিয়া যে মহাজনের নিকট নাগমহাশয় ঋণ লইয়াছিলেন পরদিন সেই মহাজন তাঁহাকে দেখিতে আসেন। নাগমহাশয় তাঁহাকে করজোড়ে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "আপনার ঋণ শোধ করিয়া যাইতে পারিলাম না। এ দেহ আর বেশীদিন থাকিবে না। আপনার দয়ায় পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু আপনি চিন্তা করিবেন না। এ বাড়ী আপনারই রহিল। আপনি যথাসময়ে দখল করিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবেন।" পরে মাতাঠাকুরাণীকে উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "উনি অবশিষ্ট জীবন পিত্রালয়ে যাইয়া থাকিবেন।" নাগমহাশয়ের কথায়

মহাজন কাতর হইয়া বলিলেন, "আপনি এ সামান্য ঋণের বিষয় কিছুমাত্র ভাবিবেন না। আমি টাকার জন্য আসি নাই, আপনাকে দর্শন করিতে আসিয়াছি।" 'সকলি ঠাকুরের দয়া, দয়া!' বলিতে বলিতে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

মহাজন চলিয়া যাইবার প্রায় তিন ঘণ্টা পর সহসা নাগ-মহাশয়ের ভাবান্তর হইল। বিছানায় ছট্‌ফট্ করিতে করিতে প্রলাপ বকিতে লাগিলেন। ভয়ানক শীত, কিন্তু দুইখানি পাখায় বাতাস করিয়াও তাঁহাকে সুস্থ করিতে পারা গেল না। ঘন ঘন উঠিয়া বসিতে চাহিলেন। একবার নটবরবাবু তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলেন; আবার শোয়াইয়া দেওয়া হইল। নাগমহাশয় কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রহিলেন, কিন্তু আবার বিড় বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিলেন। তখন নটবরবাবু চলিয়া গিয়াছেন। মাতা-ঠাকুরাণী ও আমি বসিয়া আছি। সহসা নাগমহাশয় 'বাঁচাও বাঁচাও' বলিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। মাতাঠাকুরাণী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "আপনি না আমায় বলিয়াছিলেন—মৃত্যুকালে এতটুকু মোহও আপনাকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না! তবে কেন এমন করিতেছেন?" আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া বসিয়া আছি। প্রায় আধঘণ্টা পরে নাগমহাশয় একটু সুস্থ হইলেন, তাঁহার তন্দ্রাবেশ আসিল। তন্দ্রাবসানের পর ন্যাকড়ার পলিতা করিয়া আমি তাঁহাকে একটু উষ্ণ দুগ্ধ পান করাইলাম।

নাগমহাশয়ের এই ক্ষণিক আচ্ছন্নতার সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, "তোরা তখন তাঁর বাহিরটাই ত দেখিতেছিলি, ভিতরের ত কিছুই জানিতে পারিস নাই। ভিতরে তিনি পূর্ণপ্রজ্ঞ হইয়াই

অবস্থান করিতেছিলেন। শরীর ধারণ করিলে, এক আধটুকু জৈবিক ধর্ম না থাকিলে তাহাকে আর শরীরী বলা যায় না। ঐরূপ অবস্থা সকল মহাপুরুষেই দেখা গিয়াছে, ইহাতে জীবন্মুক্ত নাগমহাশয়ের কিছুমাত্র আসে যায় না। আর তিনি যে 'বাঁচাও' বলিয়াছিলেন কি অর্থে, তাহাও স্থির বলা যায় না। বোধ হয় অনিত্য দেহ ছাড়িয়া স্বস্বরূপে অবস্থান জন্যই ঐরূপ উদ্বেগের বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকিবেন।"

শ্রীযুক্ত গিরিশবাবু বলিতেন, "শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদগণ কেহই কৈবল্যমুক্তির আকাঙ্ক্ষা করেন না। আকাঙ্ক্ষা করিলেও তাঁহাদের নির্বাণমুক্তি হয় না। কারণ ভগবান যখন পুনরায় দেহধারণ করিয়া অবতীর্ণ হন, সঙ্গে সঙ্গে যুগাবতার-পার্ষদগণকেও আবার দেহধারণ করিয়া আসিতে হয়। নাগমহাশয়ের সংসারে এতটুকু আঁট ছিল না। মায়ামুক্ত মহাপুরুষ নাগমহাশয় বাঁচিবার যদি একটু সাধ না রাখিবেন ত কি লইয়া কোন্ সূত্রে আবার ভগবানের সহিত নরদেহে আগমন করিবেন! এইজন্যই নাগমহাশয় পুনরায় নরশরীরধারণরূপ সামান্য বাসনা রাখিয়া দেহত্যাগ করিয়াছেন। সে বাসনা কেবল ভগবানের পূর্ণলীলার পুষ্টিসাধন জন্য।" যাহাই হউক, মৃত্যুর পূর্বে আর কোন দিন তাঁহাকে মোহ স্পর্শ করে নাই।

মহাসমাধিলাভের তিন দিন পূর্বে নাগমহাশয় আমায় পঞ্জিকা দেখিয়া যাত্রার দিন স্থির করিতে বলেন। তখন আমি বুঝিতে পারি নাই যে, তিনি মহাযাত্রার দিন স্থির করিতে বলিতেছেন। পঞ্জিকা দেখিয়া বলিলাম, "১৩ই পৌষ ১০টার পর যাত্রার বেশ দিন আছে।" তাঁহার উত্তর শুনিয়া স্তম্ভিত হইলাম। নাগমহাশয়

বলিলেন, "আপনি যদি অনুমতি করেন, তবে ঐ দিনেই মহাযাত্রা করিব।" আমার প্রাণ কেমন আকুল হইয়া উঠিল, আমি কাঁদিয়া গিয়া মাতাঠাকুরাণীকে সকল কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন, "আর কেন কাঁদ, বাবা, উনি কিছুতেই আর শরীর রাখিবেন না। ওঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হউক, রামকৃষ্ণের ইচ্ছা পূর্ণ হউক! উনি সজ্ঞানে দেহত্যাগ করুন, দেখে আমরা আনন্দিত হব।"

শুভদিন স্থির করিয়া নাগমহাশয় নিশ্চিন্ত হইলেন। মৃত্যুর দুই দিন পূর্বে রাত্রি দুইটার সময় মাতাঠাকুরাণী, হরপ্রসন্নবাবু ও আমি শয্যাপার্শ্বে বসিয়াছিলাম, নাগমহাশয় চক্ষু মুদিয়া শুইয়াছিলেন। সহসা চক্ষু মেলিয়া ব্যস্তভাবে আমায় বলিলেন, "ঠাকুর এসেছেন, আমায় আজ তিনি তীর্থদর্শন করাবেন।" আমাকে নীরব দেখিয়া তিনি পুনরায় বলিলেন, "আপনি যেসকল তীর্থ দেখিয়াছেন, একে একে নাম করুন, আমি দেখিতে থাকি।" আমি সম্প্রতি হরিদ্বারে গিয়াছিলাম, তাহারই নাম করিলাম। নাগমহাশয় অমনি উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "হরিদ্বার—হরিদ্বার! ঐ যে মা ভাগীরথী কলকল নিনাদে পাহাড় হইতে নামিয়া আসিতেছেন! ঐ যে মায়ের তরঙ্গভঙ্গে তীরতরুরাজি দুলিতেছে! ওপারে, ঐ যে চণ্ডীর পাহাড়! ওঃ কত ঘাট মায়ের গর্ভে নামিয়াছে! আপনি একটু থামুন, আমি আজ বিশ বৎসর স্নান করি নাই, একবার মায়ের গর্ভে স্নান করিয়া মানবজন্ম সফল করিয়া যাই!" 'গঙ্গা, গঙ্গা, মা পতিতপাবনী, মা অধমতারিণী' বলিতে বলিতে নাগমহাশয় গভীরসমাধিমগ্ন হইলেন। সমাধিভঙ্গে আমার মনে হইল তিনি যথার্থ ই স্নান করিয়া উঠিতেছেন।

নাগমহাশয় অন্য তীর্থের নাম করিতে বলিলেন। আমি যন্ত্র-চালিতবৎ প্রয়াগতীর্থের নাম করিলাম। তিনি তখনি 'জয় যমুনে, জয় গঙ্গে!' বলিয়া প্রণাম করিতে লাগিলেন। তাহার পর বলিলেন, "এখানেই না ভরদ্বাজের আশ্রম? কৈ, তা ত দেখতে পাচ্ছি না। ঐ যে গঙ্গা-যমুনার মিলিত ধারা! ঐ যে ওপারে পাহাড় দেখছি! হায়, ঠাকুর ত ভরদ্বাজের আশ্রম দেখাচ্ছেন না।" যেন একটু তন্দ্রাবিষ্ট হইলেন। দুই-তিন মিনিট পরে বলিলেন, "হাঁ, ঐ যে মুনির কুটীর দেখা যাচ্ছে!" আবার ক্ষণেক নীরব থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "মা, তুমি রাজরাজেশ্বরী, মহাশক্তির অবতার হয়ে কেন বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছ?" 'জয় রাম, জয় রাম' বলিতে বলিতে নাগমহাশয় আবার গভীর সমাধিতে মগ্ন হইলেন। সমাধিভঙ্গে আমি সাগরতীর্থের নাম করিলাম। তিনি যেন সগরবংশের উদ্ধার প্রত্যক্ষ দেখিতে লাগিলেন। সমুদ্রদর্শন করিয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিতে লাগিলেন। তৎপরে আমি কাশীধামের নাম করিলাম। নাগমহাশয় অমনি বলিতে লাগিলেন, "জয় শিব! জয় শিব! বিশ্বেশ্বর! হর হর ব্যোম ব্যোম।" তৎপরে বলিলেন, "এবার আমি মহাশিবে লয় হইয়া যাইব।" তাহার পর শ্রীজগন্নাথক্ষেত্র; নাগমহাশয় শুনিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "ঐ যে উচ্চ মন্দির! ঐ যে আনন্দবাজারে মহাপ্রসাদ বেচা কেনা হইতেছে!" আমার মনে হইল যেন তিনি দুই একবার শ্রীচৈতন্যের নাম করিলেন। এইরূপে ক্রমে রাত্রি চারিটা বাজিয়া গেল, নাগমহাশয়ের যেন একটু তন্দ্রাবেশ আসিল। পরদিন প্রভাত হইবার পরও তাঁহার সে নিদ্রাবেশ ভাঙ্গিল না। গ্রামের একজন

ডাক্তারকে ডাকা হইল। তিনি আসিয়া এক পুরিয়া হোমিও-প্যাথিক ঔষধ দিলেন। আমি তাঁহাকে সেই ঔষধ খাওয়াইয়া দিলাম। ন্যাকড়ার পলিতা করিয়া একটু দুধও খাওয়াইলাম। নাগমহাশয়ের জীবনের এই শেষ আহার। আহার দিয়া আমার স্মরণ হইল, তাঁহার জীবনের আজ শেষ দিন।

১৩ই পৌষ ৮টার পর হইতে তাঁহার মুহুর্মুহুঃ ভাব হইতে লাগিল। আমি তাঁহার কর্ণমূলে অবিরাম শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শুনাইতে লাগিলাম। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি তাঁহার সম্মুখে ধরিয়া বলিলাম, "যাঁহার নামে আপনি সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন, এই তাঁহার প্রতিমূর্তি।" দর্শন করিয়া তিনি করজোড়ে প্রণাম করিলেন এবং অতি ক্ষীণ কণ্ঠে বলিলেন, "কৃপা, কৃপা—নিজগুণে কৃপা!" ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ কথা।

বেলা নয়টার সময় নাগমহাশয়ের মহাশ্বাস আরম্ভ হইল, চক্ষু ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, ওষ্ঠাধর কম্পিত হইতে লাগিল, মুখে যেন কিছু বলিতেছিলেন! ইহার প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে তাঁহার দৃষ্টি হঠাৎ নাসাগ্রবদ্ধ হইল। সর্বশরীর কণ্টকিত, রোমাবলী পুলকিত, নয়নপ্রান্তে প্রেমধারা। ধীরে ধীরে প্রাণবায়ু ক্রমে মূলাধার হইতে পদ্মে পদ্মে ঊর্ধ্বে উঠিতেছে, নাভি হইতে হৃৎপদ্মে আসিলে ঘন ঘন শ্বাস বহিতে লাগিল। তাহার পর বেলা দশটা পাঁচ মিনিটের সময় নাগমহাশয় মহাসমাধিতে নিশ্চল হইয়া অবস্থান করিলেন। বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। মাতাঠাকুরাণী আমাকে বলিলেন, "ইনি গৃহী ছিলেন, ইঁহার শেষকালেও গৃহীর ধর্ম পালন করা তোমাদের উচিত।" মায়ের আজ্ঞানুসারে কৈলাসবাবু, পার্বতীবাবু,

আদিত্যবাবু ও আমি ধরাধরি করিয়া নাগমহাশয়কে বাহিরে আনিলাম। একখানি তক্তাপোশে উত্তম শয্যা পাতিয়া তাঁহাকে শয়ন করাইলাম। এখনও তাঁহার প্রাণবায়ু ধিকি ধিকি বহিতেছে; বাহিরে আনিবার ৫।৭ মিনিট পরে তাহাও স্থির হইল; সব ফুরাইল, নাগমহাশয় ইহজগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়া গেলেন। এখনও তাঁহার মুখমণ্ডল জ্যোতির্ময়, অর্ধনিমীলিত নয়নপ্রান্তে প্রেমাশ্রুবিন্দু। রোদনের রোল উঠিল। আমি মাতাঠাকুরাণীকে বলিলাম, "মা, স্থির হও, তোমার ভয় কি ? তোমার ভার তিনি আমাদের দিয়া গিয়াছেন। তোমার এতগুলি ছেলে, এদের মুখ চাহিয়া বুক বাঁধ।" শোকের প্রথম বেগ প্রশমিত হইলে মাতাঠাকুরাণীর আজ্ঞানুসারে কৈলাসবাবু ঘৃত, ধুনা ও চন্দনকাষ্ঠ আনিতে নারায়ণগঞ্জে চলিয়া গেলেন। মহাযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিবার পূর্ণ আয়োজন হইতে লাগিল।

অন্যান্য ভক্তগণের সাহায্যে আমি নাগমহাশয়ের উপর একখানি চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া দিলাম; পল্লীর প্রবীণ প্রতিবাসিগণ আসিয়া শব পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন শরীর তখনও উষ্ণ রহিয়াছে, দাহ করা কর্তব্য কিনা তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম, "নাগ-মহাশয়ের ন্যায় মহাপুরুষের শরীর অন্ততঃ দ্বাদশ ঘণ্টাকাল রাখিয়া তবে অগ্নিসংকার করা বিধেয়। গ্রামের সর্ববয়োজ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত কামিনীকান্ত গাঙ্গুলীর পিতা শ্রীযুক্ত কাশীকান্ত গাঙ্গুলী আমার কথা সুসঙ্গত মনে করিয়া সকলকে এইরূপ বলিয়া গেলেন। স্থির হইল রাত্রি দশটার পর অগ্নিকার্য করা হইবে। সে পর্যন্ত সেই পবিত্র দেহ প্রাঙ্গণেই রাখা হইল। তখন আমার মনে হইল, আর কিছু

পরেই ত এই পবিত্র মূর্তি অগ্নিস্পর্শে ভস্মরাশি হইবে। একখানি ফটো তুলিয়া রাখা কর্তব্য। নারায়ণগঞ্জে লোক পাঠান হইল। ফটোগ্রাফার তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না, তাঁহার আসিতে বেলা প্রায় তিনটা বাজিল। জীবিতকালে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও আমরা নাগমহাশয়ের ছবি তোলাইতে পারি নাই ; তিনি বলিতেন, "এ ছাই হাড়মাঁসের খাঁচায় আবার ছবি রাখিবার প্রয়োজন কি ?" যে রসনা আমাদের প্রতিবাদ করিত উহা এখন চির নীরব। গন্ধ-মাল্যে তাঁহার পবিত্র দেহ চর্চিত করিয়া নির্বিবাদে দুইখানি ছবি তোলা হইল। এই ছবি হইতেই ৺প্রিয়নাথ সিংহ একখানি তৈলচিত্র অঙ্কিত করেন। এখনও তাহা নাগমহাশয়ের বাটীতে আছে। এই গ্রন্থে যে ছবি দেওয়া হইল তাহা ঐ তৈলচিত্র হইতে তোলা।

সূর্যাস্তের পূর্বে ফুল, বিল্বদল, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি দিয়া মাতাঠাকুরাণী নাগমহাশয়ের পাদপদ্ম পূজা করিলেন। সাতবার তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করিয়া সুদীর্ঘ কেশপাশে তাঁহার পদযুগল মুছাইয়া দিলেন। সহস্রাধিক বিল্বফল সংগ্রহ করিয়া নানাবিধ পুষ্প দিয়া নাগমহাশয়ের পবিত্র দেহ আমরা সজ্জিত করিলাম। তখন নাগ-মহাশয়ের মৃত্যুসংবাদ পল্লীর ঘরে ঘরে রাষ্ট্র হইয়াছিল, চারিদিক হইতে আবালবৃদ্ধবনিতা হাহাকার করিয়া ছুটিয়া আসিল, গ্রামের প্রতিগৃহ হাহাকারে পূর্ণ হইল।

রাত্রি দশটার পর আমরা চন্দনকাষ্ঠ দ্বারা নাগমহাশয়ের শেষ শয্যা রচনা করিলাম এবং যথাশাস্ত্র ক্রিয়াতে সে পবিত্র দেহ অগ্নিমুখে আহুতি দিলাম। তাহার পর সেই জলন্ত চিতায় আমি বিল্বপত্রে

ব্যাহৃতি হোম করিতে আরম্ভ করিলাম। ইতোমধ্যে স্বামী সারদানন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং চিতাসম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তিন ঘণ্টার মধ্যে নাগমহাশয়ের মর্ত্যদেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া গেল। মাতাঠাকুরাণী চিতা নির্বাণ করিলেন।

তিনি ব্যতীত আমরা আর কেহ স্নান করিলাম না, সে পবিত্র দেহের পূত ভস্মরাশি স্পর্শ করিয়া সকলেই শুদ্ধ হইলাম। পিতার পরলোকপ্রাপ্তির তিন বৎসর পরে ৫৩ বৎসর ৪ মাস ৭ দিন বয়সে জন্মভূমি দেওভোগে নাগমহাশয়ের মৃন্ময় দেহ মিশিয়া গেল, চিহ্নস্বরূপ রহিল কেবল ভস্মরাশি !

পরদিন সে পূত ভস্মরাশি স্বামী সারদানন্দের আদেশে একটি পিতলের কলসে পূর্ণ করিয়া নাগমহাশয়ের স্বরচিত একটি সঙ্গীত তন্মধ্যে রাখিয়া সেই চিতাভূমিতে প্রোথিত করা হইল। মৃত্যুর পূর্বে তিনি যে কালীপূজা করিয়াছিলেন স্বামী সারদানন্দ সেই শ্যামা প্রতিমাখানি সমাধির উপর স্থাপন করিতে বলিলেন। তাহার উপর একখানি সুন্দর চন্দ্রাতপ টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইল।

নাগমহাশয়ের ঋণ সম্বন্ধে আলোচনা ও উপদেশ প্রদান করিয়া স্বামী সারদানন্দ ঢাকায় চলিয়া গেলেন। চতুর্থ দিনে সে চিরশান্তিময় স্থান হইতে চিরবিদায় লইয়া আমিও কলিকাতায় চলিয়া আসিলাম।

পরিশিষ্ট

নাগমহাশয়ের স্বরচিত কয়েকটি গীত পাঠকবর্গকে উপহার দিবার জন্য আমরা প্রতিশ্রুত ছিলাম। এইস্থানে সেগুলি সন্নিবেশিত হইল।

(১)

গিরিবর!
আর কবে যাবে উমারে আনিতে কৈলাসভবনে।
না হেরিয়া বিধুমুখ হৃদয়ে দারুণ দুঃখ,
কত আর সহিব জীবনে॥
শুনিয়া শিবের রীতি, হৃদয়ে উপজে ভীতি,
ভূত প্রেত সঙ্গে সাথী, থাকে নাকি শ্মশানে॥
কি কব তাহার গুণ, কপালে জ্বলে আগুন,
সিদ্ধিতে বড় নিপুণ, আপন পর না জানে॥
দীন অকিঞ্চনে ভাবে, তুষ্ট করি আশুতোষে
আনহ প্রাণের গৌরী, নৈলে মরিব পরাণে॥

(২)

(কালী) আমি দিনে দিনে ক্ষুণ্ণমনে,
ভবজ্বালায় জ্বলে মরি।
দয়া কর নিজগুণে আর যে জ্বালা সইতে নারি॥
এখন দেখা দিবে কি নাই, কি করিবে বল তাই,
দীনে দরশন চাই, দোহাই লাগে ত্রিপুরারি॥
শক্তি ভক্তি কিছুই নাই, নিজগুণে দেখ চাই,
অকিঞ্চনে দেহ ঠাঁই, শ্রীচরণে দয়া করি॥